بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

IOM

"প্রযুক্তির ফাঁদ ও তার অপকারিতা সমূহ।"

Subject: RAM 302

Submitted To:

Ustaz Abdul wahid.

Submitted by:

Amena Batul Rumpa

Roll: 20102221; 6th semester.

Date: 29/11/2022

الحمد هلل نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من
يهد هلال فال مضل
له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال هلال وأن
محمدا عبده ورسوله صلى هلال عليه وسلم! وبعد:
আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে "

প্রযুক্তির ফাঁদ ও প্রতারণা" নামক এসাইনমেন্ট টি সম্পন্ন হয়েছ।শুক্রিয়া জানাচ্ছি আমার রবের যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং বিবেক বুদ্ধি দান করেছেন। যার দেয়া পূর্নাঙ্গ জীবন ব্যাবস্থার আলোকে আমি সত্যি, সঠিক পথকে সহজেই চিন্হিত করতে পারি।আলহামদুলিল্লাহ।

অতঃপর দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমার প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মাদ সা.আ. ও, তার পরিবারবর্গ ও সাহাবীদের উপর। যিনি ইসলাম কে রেখে গিয়েছেন একটি সচ্ছ আয়নার মতো। যার মানদন্ডে আমরা আধুনিক সমাজেও হালাল হারম বুঝে জীবন পরিচলনা করতে পারছি।

মুক্বদ্দিমাঃ

পরম করুনাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি।আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার অশেষ নেয়ামতে আমরা পরিপূর্ণ।জীবন ধারনের জন্য আমাদের যতরকম সুযোগ সুবিধা প্রয়োজন আল্লাহ তা'আলা আমাদের তা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন–

#

وَاٰ تٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَ لْـتُمُوْهُ ۗ وَاِ نْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ۗ اِنَّ الْاِ نْسَا نَ لَـظَلُوْمٌ كَفَّا رٌ[1]

"যে সকল বস্তু তোমরা চেয়েছ, তার প্রত্যেকটি থেকেই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা কর, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী, অকৃতজ্ঞ।"

(QS. Ibrahim 14: Verse 34)

#

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّا قُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ[2]

ইন্নাল্লা-হা হুওয়াররাঝঝা-কুযুল কুওওয়াতিল মাতীন।

"আল্লাহ তা'আলাই তো জীবিকা দাতা শক্তির আধার, পরাক্রান্ত।"

(QS. Az-Zariyat 51: Verse 58)

রিজিকের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে তিনি সূরা আর-রহমানে বারবার বলেছেন –

فَبِاَ يِّ اٰلَآ ءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ[3]

---

[1]sura Ibrahim 14
[2]sura zariyat 51
[3]sura ar rahman

ফাবিআইয়ি আ-লাই রাব্বিকুমা-তুকাযযিবা-ন।

"অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?"

(QS. Ar-Rahman 55: Verse 13)

আল্লাহর দেয়া অসংখ্য নেয়ামতের মাঝে একটি হলো বিবেক- বুদ্ধির স্বাধীনতা।এই জ্ঞান বুদ্ধি কাজে লাগিয়েই মানুষ আজ চাঁদে যাচ্ছে তো কাল মঙ্গল গ্রহে রকেট পাঠাচ্ছে। কখনো ভূগর্ভের শিলাস্তর বা আগ্নেয়গিরি নিয়ে গবেষণা করছে তো আবার কখনো সমুদ্রের তলদেশে ভেসে বেড়াচ্ছে। আর এই সব কিছুর উৎস হচ্ছে আল কোরআন।

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানুষের জন্য যেমন কল্যান নিয়ে এসেছে তেমনি এনেছে বিপর্যয়। আমার এই প্রবন্ধে আমি বস্তুত এর উভয় দিক নিয়েই আলোচনার চেষ্টা করবো। তবে আমার মূখ্য উদ্দেশ্য সত্যতা যাচাই যা কিনা প্রযুক্তির অপব্যবহার কেই চিন্হিত করছে।

মহান আল্লাহ তাআ'লা আমার জন্য সহজ করুন।

আমেনা বাতুল রুম্পা।

IOM অনলাইন মাদ্রাসায় অধ্যায়নরত।

Alba, Italy

সূচিপত্রঃ

যে কোন বিষয়ের ভালো মন্দ জানার জন্য অবশ্য আমাদের বিষয়টি সম্পর্কে জানতে হবে। তাই আমাদের আলোচনার শুরুতেই আমরা প্রযুক্তি কি? এর বিষয়বস্তু কি? এর কাজ কি এই

সকল বিষয় সম্পর্কে জানবো ইনশাআল্লাহ। সকল প্রেক্ষাপট জানার পর আমরা এর উপকারিতা অপকারিতা আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

প্রযুক্তিঃ প্রযুক্তি হল কৌশল, দক্ষতা, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সমষ্টি যা পণ্য ও সেবা উৎপাদনে অথবা উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহৃত হয় যেমন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান। প্রযুক্তির হতে পারে কৌশল ও প্রক্রিয়ার জ্ঞান অথবা এটি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে শুধুমাত্র যন্ত্রের ধারণা যে এটি কিভাবে পরিচালিত হয় এগুলো সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান ব্যতিরেকে। কৌশল (অর্থাৎ মেশিন বা যন্ত্র) যা প্রযুক্তির ব্যবহার ইনপুট নিয়ে একটি আউটপুট ফলাফলে পরিণত করে তাকে প্রযুক্তি কৌশল বা প্রযুক্তিগত কৌশল বলে।



একটি স্টিম টারবাইন। এরকম টারবাইনই আজকাল ব্যবহৃত সর্বাধিক বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। বিদ্যুতের ব্যবহার ও জীবনযাত্রার মান একে অপরের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।

প্রযুক্তির সরলতম রূপ হল মৌলিক সরঞ্জামের বিকাশ ও ব্যবহার। প্রাগৈতিহাসিক কালে আগুন নিয়ন্ত্রণের আবিষ্কার ও পরবর্তীকালে নব্যপ্রস্তর যুগীয় বিপ্লব খাদ্যের উৎসের বৃদ্ধি করেছে এবং চাকার আবিষ্কার মানুষকে এই পরিবেশে পরিভ্রমণ ও নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করেছে। ক্রমে ক্রমে ছাপাখানা, টেলিফোন, মোবাইল, কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের আবিষ্কার যোগাযোগ ক্ষেত্রে মানুষের শারীরিক বাঁধাকে দূর করেছে এবং মানুষকে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে মুক্তভাবে যোগাযোগে সক্ষম করেছে।
প্রযুক্তির অনেক প্রভাব রয়েছে। এটি অধিক সমৃদ্ধ অর্থনীতি বিকাশে সাহায্য করেছে (বর্তমানের বৈশ্বিক অর্থনীতি সহ) এবং যার ফলে বিলাসী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। অনেক প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়ায় অনাকাঙ্ক্ষিত উপজাত উৎপন্ন হয় যা দূষণ হিসেবে পরিচিত এবং যা প্রাকৃতিক সম্পদের অবনতির মাধ্যমে পৃথিবীর পরিবেশের ক্ষতি করে। উদ্ভাবন সর্বদাই সমাজের মূল্যবোধকে প্রভাবিত

করে ও সাথে সাথে প্রযুক্তির শিষ্টাচার নিয়ে নতুন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। উদাহরণের মধ্যে রয়েছে দক্ষতার ভিত্তিতে খ্যাতির নির্ধারণ জৈব শিষ্টাচার কে বাধাগ্রস্ত করে।
প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে দার্শনিক যুক্তি তর্ক এখনো একমত নয় যে এটি মানুষের পরিস্থিতির উন্নতি করেছে নাকি অবনতি করছে। নব্য-লুডিজম, অ্যানার্কো-আদিমবাদ এবং অনুরূপ প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন প্রযুক্তির বিস্তারকে সমালোচনা করে যুক্তি দেন যে এটি মানুষের ক্ষতি করে। অন্যদিকে টেকনো-প্রগতিবাদ মতামতের সমর্থকরা প্রযুক্তিকে সমাজের পক্ষে উপকারী মনে করেন।
প্রযুক্তি বলতে কোন একটি প্রজাতির বিভিন্ন যন্ত্র এবং প্রাকৃতিক উপাদান প্রয়োগের ব্যবহারিক জ্ঞানকে বোঝায়। নিজের প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে প্রজাতিটি কেমন খাপ খাওয়াতে পারছে এবং তাকে কিভাবে ব্যবহার করছে তাও নির্ধারণ করে প্রযুক্তি। মানব সমাজে প্রযুক্তি হল বিজ্ঞান এবং প্রকৌশলের একটি আবশ্যিক ফলাফল। অবশ্য অনেক প্রাযুক্তিক উদ্ভাবন থেকেই আবার বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের অনেক জ্ঞানের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। মানব সমাজের প্রেক্ষিতে প্রযুক্তির সংজ্ঞায় বলা যায়, "প্রযুক্তি হল কিছু প্রায়োগিক কৌশল যা মানুষ তার প্রতিবেশের উন্নয়নকার্যে ব্যবহার করে।" যেকোন যন্ত্র এবং প্রাকৃতিক উপাদান সম্বন্ধে জ্ঞান এবং তা দক্ষভাবে ব্যবহারের ক্ষমতারকেও প্রযুক্তি বলা হয়।
আমরা যে পৃথিবী তে বাস করি তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই আমরা প্রযুক্তি ব্যবহার করি। প্রযুক্তি হল জ্ঞান, যন্ত্র এবং তন্ত্রের ব্যবহার কৌশল যা আমরা আমাদের জীবন সহজ করার স্বার্থে ব্যবহার করছি।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিঃ বর্তমানে আমরা বিভিন্ন প্রযুক্তি যেমন বই, কলম, টেবিল, বৈদ্যুতিক বাতি, ঘড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করে লেখাপড়া করছি। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যবহার করে এ সকল প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে । বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে পার্থক্য কী? এদের মধ্যে কী সম্পর্ক রয়েছে?

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পার্থক্যঃ

বিজ্ঞান হলো প্রকৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান যা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাকৃতিক ঘটনাকে ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করে। প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করেন। যার মধ্যে নিম্নোক্ত ধাপগুলো রয়েছে।

প্রযুক্তি হল আমাদের জীবনের বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ।প্রযুক্তি মানুষের জীবনের মান উন্নয়নে বিভিন্ন পণ্য, যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতির উদ্ভাবন করে। যেমন - বিজ্ঞানীরা বিদ্যুৎ নিয়ে গবেষণা করে এ বিষয়ে আমাদের ধারণা বা জ্ঞান সৃষ্টি করেছেন। এই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আবার ফ্রিজ, টেলিভিশন, মোবাইল এবং বৈদ্যুতিক বাতি উদ্ভাবনে কাজে লাগানো হয়েছে।প্রযুক্তি ব্যবহারের নানান ক্ষেত্র রয়েছে। যেমন - শিক্ষা, চিকিৎসা, যোগাযোগ, যাতায়াত ইত্যাদি।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সম্পর্কঃ

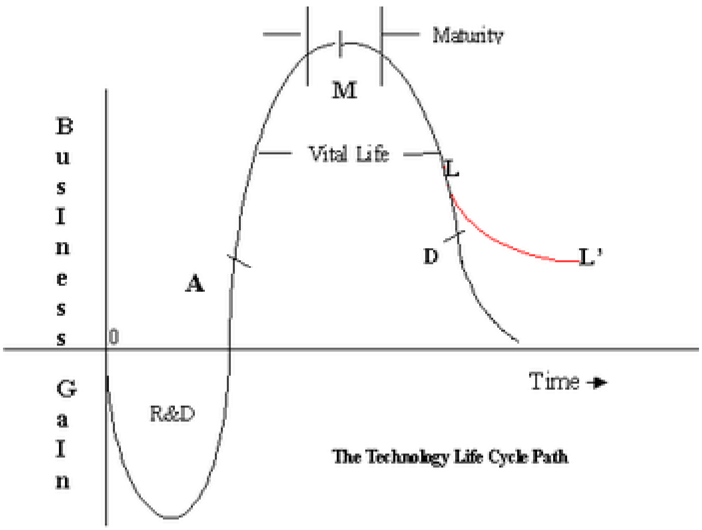
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উদ্দেশ্য ভিন্ন হলেও আমাদের জীবনে এদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এরা পরস্পরের সাথে নিবিড় ভাবে সম্পর্কিত। অতীতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে এত নিবিড় সম্পর্ক ছিল না। বিজ্ঞানীরা প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং বিভিন্ন ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সেখানে ব্যবহারিক জীবনের সমস্যা সমাধানের কোনো উদ্দেশ্যে ছিল না। তারা বিদ্যুৎ ও আলোর মত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আবিষ্কার করেছেন। অপরদিকে জীবনকে উন্নত করার লক্ষ্যে বাস্তব সমস্যা

সমাধানের জন্য মানুষ প্রযুক্তির উদ্ভাবন করেছে।তারা পাথরের হাতিয়ার, আগুন, পোশাক, ধাতব যন্ত্রপাতি এবং চাকার মত সরল প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে।

আঠারো শতকে শিল্প বিপ্লবের সময়কালে প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। বিশেষ করে কৃষি, শিল্প-কারখানা, পরিবহন ইত্যাদি ক্ষেত্রে। বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত জলীয় বাষ্পের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে মানুষ বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার করেছে। এই বাষ্পীয় ইঞ্জিন কল-কারখানা রেল গাড়ি এবং জাহাজ চালাতে ব্যবহার করা হতো।

বিভিন্ন প্রশ্ন ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে মানুষ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যবহার করে থাকে। বিজ্ঞানীরা প্রকৃতি নিয়ে গবেষণার সময়ও প্রযুক্তির ব্যবহার করে থাকেন। যেমন - দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা মহাকাশের বিভিন্ন বস্তু পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। খালি চোখে দেখা যায় না এমন জিনিস অনুসন্ধানে বিজ্ঞানীরা অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করে থাকেন। বর্তমানকালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি একে অপরের উপর নির্ভরশীল।

প্রযুক্তির জীবন চক্রঃ



প্রযুক্তির জীবনচক্র (টিএলসি) একটি পণ্যের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পর্ব থেকে বাজারের পরিপক্কতা পর্যন্ত অবশেষে পতন পর্যন্ত ব্যয় এবং লাভের বর্ণনা দেয়। গবেষণা ও উন্নয়নের (আরএন্ডডি) ব্যয়গুলো একবার পণ্য বাজারে আসার পরে অবশ্যই লাভ দ্বারা ভারসাম্য করতে হয়। প্রযুক্তির জীবনচক্র মূলত উন্নয়নের ব্যয় এবং এর থেকে সম্ভাব্য লাভ এর মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে।

প্রযুক্তির জীবন চক্রের চারটি পর্যায় রয়েছে। পাশের চিত্রে এটি বোঝা যাচ্ছে। ধাপ চারটি হচ্ছে -

1. গবেষণা ও উন্নয়ন (আরএন্ডডি) - এই পর্যায়ে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের জন্য বিনিয়োগের ঝুঁকি নেওয়া হয় ।সংস্থা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান গুলো গবেষণা ও উন্নয়নে কৌশলগত দিক নির্দেশনার মাধ্যমে ধীরে ধীরে একটি প্রযুক্তির পরীক্ষামূলক সংস্করণে পৌঁছায়।
2. সমুত্থান ও বাণিজ্যিকীকরণ- এই পর্বে পণ্য আবিষ্কার থেকে সম্পূর্ণরূপে ব্যয় পুনরুদ্ধার করা সময়সীমার অন্তর্ভুক্ত।এই পর্যায়ে আবিষ্কারের দ্রুত বৃদ্ধি ও বন্টন দেখা যায় এবং নতুন ও অধিক কার্যকরী পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক সুবিধার দ্বার উন্মোচিত হয়।

3. ব্যাপন ও পরিপক্কতা – যেহেতু জনসাধারণ নতুন উদ্ভাবন গ্রহণ করে তাই প্রতিযোগিরা বাজারে প্রবেশ করে এবং জোগান চাহিদাকে অতিক্রম করতে শুরু করে। এই পর্যায়ে, ধারণাটি স্বাভাবিক হওয়ার সাথে সাথে বিনিময় ধীর হতে শুরু করে।
4. পতন ও প্রতিকল্পন – চূড়ান্ত পর্যায়ে যখন পণ্য সুবিধা ও সম্ভাব্য মূল্য নিয়ন্ত্রিত হয় তখন উৎপাদন ও বিক্রয় কমতে থাকে। এই হ্রাস একসময় পতনে পৌঁছে যায়। তখন সংস্থাগুলো নতুন উদ্ভাবনের দিকে অগ্রসর হয়।

প্রযুক্তির ক্ষেত্রসমূহঃ

- এরোস্পেস প্রযুক্তি: মহাকাশ অভিযানের জন্য ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ যান তৈরি এবং চালনা। নভোযান উৎক্ষেপণ, উচ্চ গতি সম্পন্ন আকাশযান, বিমান , নভোযান নির্দেশনার জন্য ব্যবহৃত ভূ-কেন্দ্রিক উপকরণসময় তৈরি এই প্রযুক্তির কাজ। ভৌগোলিক যোগাযোগ এবং তথ্য চালনা পদ্ধতি এখান থেকেই উন্নয়ন লাভ করে।
- কৃষি প্রযুক্তি: এই প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রথাগত ট্রাক্টর এবং চাষের অন্যান্য যন্ত্রপাতির সাথে আধুনিক ল্যাপটপ এবং গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম-এর সমন্বয় ঘটায়। খাদ্য উৎপাদনের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় তলিয়ে দেখা এবং উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিই এর মূল কাজ।
- জৈব প্রযুক্তি: এটি জীবনের মূল উপাদান এবং একক যেমন, কোষ, জিন এবং ব্যাক্টেরিয়া নিয়ে অধ্যয়ন করে । এর মাধ্যমে নতুন খাদ্য এবং ওষুধ, মানুষের জিনের নকশা ইত্যাদি তৈরি করা হয় যাতে রোগ প্রতিরোধ এবং জৈবিক ঝুঁকি নির্ণয় করা যায়।
- নির্মাণ প্রযুক্তি: নির্মাণ প্রযুক্তি পৌর প্রকৌশল এবং প্রযুক্তি কে একত্র করে বসবাসের এবং কাজের নিরাপদ পরিবেশ তৈরি, পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা করে।এটি দালানকোঠা, রাস্তাঘাট, জন-পরিবহন ব্যবস্থা, টানেল, পানি পরিশোধন, ব্রিজ ইত্যাদির ডিজাইন এবং নির্মাণ নিয়ে কাজ করে।
- প্রকৌশল প্রযুক্তি: ইলেকট্রনিক্স এবং বলবিদ্যা থেকে শুরু করে জেট ইঞ্জিন এবং আকাশযান পর্যন্ত প্রকৌশল প্রযুক্তি সমস্ত কিছু তৈরি করে যা আমাদের পৃথিবীকে চালায়। এই বিস্তারিত ক্ষেত্র বস্তু কিভাবে কাজ করে তা বুঝার জন্য এর বিশেষত্ব সহ গণিত, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির নীতি গুলো কাজে লাগায়।
- পরিবেশগত প্রযুক্তি: পরিবেশগত প্রযুক্তি আমাদের জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুর গুনাগুন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের নির্ভরযোগ্যতা বুঝতে সক্ষম করেছে।পরিবেশের উপর মানুষের ক্রিয়া-কলাপ এর প্রভাব ও শক্তির নবায়নযোগ্য উৎস এর সঠিক ব্যবহার পরিদর্শন এবং বুঝতে এই প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়।
- ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা: জিআইএস এবং জিপিএস রক্ষণশীল নকশা প্রযুক্তিকে আমাদের হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে। জিপিএস বিভিন্ন স্থানের অবস্থান নির্ণয় ও পরিভ্রমণ করতে ভূগোল এবং কৃত্রিম উপগ্রহ প্রযুক্তি ব্যবহার করে। এর অনুষাঙ্গিক প্রযুক্তি জিআইএস কম্পিউটার থেকে উৎপন্ন স্থল ও জল পরিবেশের নকশা তৈরি করে যা অন্য কোন বিকল্প উপায়ে করা সম্ভব নয়।
- তথ্য প্রযুক্তি: তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) হলো আজকের কম্পিউটারাইজড ও ওয়্যারলেস দুনিয়ার কেন্দ্র যার মধ্যে আমরা বসবাস করি।এটির যেমন একটি ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে ইলেকট্রনিক্স তত্ত্বের সমন্বয়ে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার তৈরি করছে তেমনি একটি প্রযুক্তি হিসেবে বর্তমানে অন্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রগুলোকে সচল করছে। আইটি যেকোনো ধরনের তথ্য তৈরি, জমা ও

আদান প্রদানে ব্যবহৃত হয় যেমন – বিজনেস ডাটা, ভয়েস কমিউনিকেশন, ফটোগ্রাফি ও গ্রাফিক্স ইত্যাদি।

- উৎপাদন প্রযুক্তি: আমরা যে খাদ্য খাই, যে গাড়ি চালাই, যে কম্পিউটার ও ওষুধ ব্যবহার করি ওদের জীবন নিরাপদ ও সহজ করার জন্য এই সমস্ত কিছু একটি সুনির্দিষ্ট উৎপাদন প্রক্রিয়ার ফলাফল। উৎপাদন প্রযুক্তি কম্পিউটার ও অর্ধপরিবাহী এবং এদের উপাংশ তৈরি করে। এটি যান্ত্রিক এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতা কাজে লাগিয়ে যন্ত্র ও উৎপাদন ব্যবস্থা তৈরি করে।
- নৌ প্রযুক্তি: নৌ প্রযুক্তি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও প্রকৌশল কে সমন্বয় করে পানির নিচের জগতে বিচরণ করে। নৌ প্রযুক্তিবিদ সাবমারসিবল রোবট, সোনার এবং আন্ডারওয়াটার স্যাটেলাইট ব্যবহার করে পানির নিচের সামুদ্রিক পরিবেশ, বাস্তুসংস্থান, জলবায়ু ও প্রাকৃতিক শক্তির উৎস বুঝতে সক্ষম হন।
- মাইক্রো প্রযুক্তি ও ন্যানো প্রযুক্তি: মাইক্রো প্রযুক্তি প্রচলিত যন্ত্রপাতি কে ক্ষুদ্র লেভেলে পরিচালিত করে। এই প্রযুক্তি এমন ক্যামকর্ডার ও কম্পিউটার তৈরি করেছে যা হাতের মুঠিতে মধ্যে রাখা সম্ভব। ন্যানো প্রযুক্তি আরো এক ধাপ এগিয়ে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম যন্ত্রের উদ্ভাবন করেছে।
- রাসায়নিক প্রযুক্তি: রাসায়নিক প্রযুক্তি বিভিন্ন ধরনের কাঁচামাল যেমন তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি নিয়ে পরিশোধিত করে প্রচলিত বিভিন্ন জ্বালানি থেকে শুরু করে বর্তমানে বিভিন্ন আধুনিক বহনযোগ্য শক্তির উৎস উৎপন্ন করছে। এই প্রযুক্তি বিভিন্ন উপাদান বিশুদ্ধকরণ এর ক্ষেত্রে ও ব্যবহৃত হয়।
- যাতায়াত প্রযুক্তি: যাতায়াত প্রযুক্তি মানুষ, পণ্য এবং সেবা কে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করে যেমন – কার, ট্রাক, প্লেন, ট্রেন, বাইক। এটি পরিবেশের উপর যাতায়াত ব্যবস্থার প্রভাব নিয়েও আলোচনা করে।

প্রযুক্তি ও ইসলামঃ

প্রযুক্তির উৎকর্ষ পৃথিবীকে অনেক দূর এগিয়ে নিচ্ছে। দিন দিন সহজ হচ্ছে মানুষের জীবনযাত্রা। কিয়ামতের আগে পৃথিবী কতটা উন্নত হবে, তা অনুমান করা দুষ্কর। তবে রাসুল (সা.)-এর কিছু হাদিস থেকে বোঝা যায়, কিয়ামতের আগে পৃথিবী প্রযুক্তিগত দিক থেকে অনেক দূর এগিয়ে যাবে।

আবু সাঈদ আল খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না হিংস্র প্রাণী মানুষের সঙ্গে কথা বলবে, যে পর্যন্ত না কারো চাবুকের মাথা এবং জুতার ফিতা তার সঙ্গে কথা বলবে এবং তার ঊরুদেশ বলে দেবে তার অনুপস্থিতিতে তার পরিবার কী করেছে। (তিরমিজি, হাদিস : ২১৮১)[4]

উল্লিখিত হাদিসে রাসুল (সা.) তিনটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যেগুলো অনেকটাই বাস্তবতার মুখ দেখছে। আজ আমরা এই প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

বোলিংগুয়াল বার্ক ট্রান্সলেটর : এটি মূলত কুকুরের ঘেউঘেউ থেকে ভাষায় রূপান্তর করে তার মনের ভাব বোঝার একটি প্রযুক্তি। গিজবট ডটকমে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, নর্দান অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক স্লোবোডচিকফ এই বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ তিন দশক গবেষণা করে চলেছেন।

এরই মধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কল্যাণে এই প্রযুক্তি আবিষ্কারে অনেক দূর এগিয়ে গেছে বিজ্ঞানীরা। ফুরবোর (ঋঁৎনড়) ওয়েবসাইট থেকে জানা গেছে, একটি বিশেষ ক্যামেরার মাধ্যমে কুকুরের সঙ্গে ভিডিও চ্যাট করা যাবে। পোষা প্রাণীটি ঠিক কী করতে চাচ্ছে, সেটি রিয়েল টাইমে ভাষান্তর করে বোঝাবে ক্যামেরা। ব্যবহারকারীর কুকুরের ওপর নজর রাখতে ক্যামেরাটি হালচাল ধারণ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে বিশ্লেষণ করে মালিককে সংকেত পাঠাবে।

কুকুরকে নজরে রাখতে ফুরবো অনেক আগে থেকেই ক্যামেরা বানাচ্ছে। কিন্তু এমন চমকপ্রদ ফিচার এই প্রথম যোগ করল তারা।

এই প্রযুক্তি আরো উন্নত হলে একসময় বাঘ, সিংহের মতো হিংস্র পশুর ভাষাও মানুষ বুঝতে সক্ষম হবে এবং তাদের সঙ্গে কথোপকথন করতে পারবে।

<u>কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন স্বয়ংক্রিয় ঘাতক অস্ত্র</u> : রাসুল (সা.)-এর হাদিসের একটি জায়গায় বলা হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষের চাবুকের মাথা তার সঙ্গে কথা বলবে ততক্ষণ কিয়ামত হবে না। অর্থাৎ কিয়ামতের আগে বিশ্ব প্রযুক্তিগতভাবে এত দূর এগিয়ে যাবে যে তারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন অস্ত্র তৈরি করতে সক্ষম হবে। রাসুল (সা.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণীও অনেকটা সত্য হয়েছে। এরই মধ্যে এমন একটি যোদ্ধা রোবট আবিষ্কৃত হয়েছে, যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন। এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রসহ বহু রাষ্ট্র এ ধরনের অস্ত্র তৈরির কথা ফাঁস হয়েছে। ২০১৫ সালে একটি কারখানায় স্বয়ংক্রিয় এক রোবটের হাতে কর্মী নিহত হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে।

পরবর্তীতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন স্বয়ংক্রিয় ঘাতক অস্ত্র মানব সভ্যতার জন্য হুমকির কারণ বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এক হাজার প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞানী ও গবেষক। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিশ্বখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং, অ্যাপলের সহপ্রতিষ্ঠাতা স্টিভ ওজনিয়াক, উদ্যোক্তা এলান মাস্ক, এমআইটির অধ্যাপক নোয়াম চমস্কি, গুগলের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি বিভাগের প্রধান ডেমিস হ্যাসাবিস প্রমুখ।

---

[4]hadis tirmi

স্মার্ট জুতা : রাসুল (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, মানুষের জুতার ফিতা তার সঙ্গে কথা বলবে। এরই মধ্যে পুরুষদের জন্য ইলেকট্রনিক স্পোর্টস শু-এর দ্বিতীয় সংস্করণ চলে এসেছে বাজারে।

অ্যান্টি-রেপ ডিভাইস : রাসুল (সা.) বর্ণিত হাদিসের শেষাংশে উল্লেখ করা হয়েছে, 'এবং তার ঊরুদেশ বলে দেবে তার অনুপস্থিতিতে তার পরিবার কী করেছে।' এই প্রযুক্তি কতটা উন্নত হবে তা অনুমান করা কঠিন। তবে মনে হয় রাসুল (সা.)-এর হাদিসের যথার্থ ব্যাখ্যা পেতে হলে আমাদের প্রযুক্তিকে আরো অনেক দূর এগোতে হবে।

অবশ্য এরই মধ্যে এর কাছাকাছি একটি প্রযুক্তি বিশ্বে চলে এসেছে। এমআইটির একজন ভারতীয় বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছেন এমন একটি প্রযুক্তি, যার মাধ্যমে কোনো নারীকে কেউ যৌন হয়রানি বা ধর্ষণ করার চেষ্টা করলে তার আশপাশের মানুষদের সতর্ক করবে। এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ওই নারী সফটওয়্যারটি অফ করতে সক্ষম না হলে সফটওয়্যারে সেট করা নাম্বারগুলোতে কল চলে যাবে এবং মোবাইলের মাধ্যমেই তার পরিবার বা বন্ধুরা সেই নারীর লোকেশন জানতে পারবে, এবং মোবাইলের স্পিকার অন হয়ে যাওয়ায় সেখানকার কথোপকথনসহ সব পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা পাবে। নব-উদ্ভাবিত এই সেন্সরটি নারীদের আন্ডার গার্মেন্টে সেট করা থাকবে। (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ডটকম, ভিডিও দেখতে : shorturl.at/bGMPU)

যেহেতু পুরুষ মানুষরা তাদের মোবাইল ফোন প্যান্টের পকেটেই রাখে এবং তার অবস্থান বেশির ভাগ সময় ঊরুর ওপরই হয়, সেহেতু বলা যায় পরিবার বিপদে পড়লে তার মোবাইলে যাওয়া নোটিফিকেশন তার ঊরুতেই ভাইব্রেশন করবে।

প্রযুক্তির নানা নামঃ

উপরের আলোচনায় আমরা প্রযুক্তি কি? বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সম্পর্ক ও আমাদের জীবনের কোন কোন শাখার সাথে প্রযুক্তি যুক্ত রয়েছে এই বিষয়ে জানলাম। এখন আলোচনার এই পর্বে আমরা এর কিছু চেহারার সাথে পরিচিত হবো। সাথে আমরা এটাও দেখবো এই প্রযুক্তি গুলো আমাদের জীবনে আশির্বাদ নাকি অভিশাপ হিসেবে কাজ করে।
আমরা এই প্রযুক্তির ফাঁদ কে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি।
প্রথমত অনলাইন ফাঁদ এবং দ্বিতীয়ত অফলাইন ফাঁদ।

অনলাইন ফাঁদঃ

অনলাইন এখন নতুন আরেক দুনিয়া। সারাদিনের একটা মূখ্য সময় এখন আমাদের কাটে অনলাইন এর নানা সাইটে। এর মাঝে আছে ফেসবুক, ইউটিউব, গোগল, টিকটিক আরো অনেক। এই সাইট গুলো উপকারী দিক রয়েছে তবে এর ক্ষতিকারক দিক ই বেশি।

মোবাইল, কম্পিউটার,ট্যাবলেট ইত্যাদি যন্ত্র গুলো প্রযুক্তির নতুন আবিষ্কার। আর আমাদের অনলাইন প্রতারণার শুরুটা এখান থেকেই হয়।চলুন এর কিছু নমুনা দেখি...

মোবাইল ফোনঃ বিজ্ঞানের কল্যাণে এমন কিছু আবিষ্কার হতে থাকে যেগুলো আমাদের জীবনকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়েছে। তার মধ্যে একটা রয়েছে মোবাইল ফোন। এই মোবাইল ফোন জীবন কে যেমন সহজ করেছে তেমনি প্রতিনিয়ত ক্ষতিগ্রস্ত ও করে যাচ্ছে। প্রযুক্তির অন্যতম উপাদান হ'ল মোবাইল যা মানুষের মাঝে যোগাযোগের ক্ষেত্রে দূরত্বকে জয় করেছে। কিন্তু মোবাইলের মাধ্যমে এখন কথা বলার চেয়ে অপসংস্কৃতির প্রচার, নগ্নতাকে উসকে দেয়া, ব্লাকমেইলিং, অশ্লীল কার্যকলাপ যেন নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে যে স্মার্ট ফোন ব্যক্তিকে স্মার্ট করতে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারত, তা আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার অন্যতম উপকরণ।

মোবাইল সিম কোম্পানীগুলোর লোভনীয় অফার ও এসবের অপব্যবহার তরুণ সমাজকে ভয়াবহ বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তারা ভুলেই যাচ্ছে পরকালে এসব কথা ও কাজের হিসাব হবে এবং এসবের রেকর্ড থাকবে। আল্লাহ বলেন,‘ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ -মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে’ *(ক্বাফ ৫০/১৮)*।



মোবাইল ফোন ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক গুলো

1. সব সময় বিভ্রান্ত (distract) করা
2. আমলের মনোযোগ নষ্ট হয়ে যাওয়া।
3. স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা
4. দুর্ঘটনা হওয়ার সুযোগ
5. অতিরিক্ত সময় নষ্ট হওয়া
6. নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তা
7. কাজে মন না বসা
8. পড়াশোনায় মন না বসা
9. মোবাইল এর প্রতি নেশা
10. ফ্রড (fraud) হওয়া
11. অতিরিক্ত খরচ

সব সময় বিভ্রান্ত (distract) করা:

যদি আআমরা প্রত্যেকটি পয়েন্ট গুলো বিস্তারিত ভাবে জেনেনেই।

পনি একটি স্মার্টফোন (smartphone) ব্যবহার করছেন, তাহলে এই বিষয়ে আপনি অবশই জানবেন।

কেননা, একটি স্মার্টফোন যদি আমাদের কাছে আছে তাহলে আমরা অন্য কোনো কাজে ভালো করে মন দিতে পারিনা।

কিছুক্ষন পর পর মোবাইলের মধ্যে এসএমএস চেক করা, সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল খুলে, ভিডিও দেখা, গেম খেলা ইত্যাদির ইচ্ছা আমাদের হয়ে থাকে।

আর এগুলোর কারণে আমাদের মন সব সময় ডিস্ট্রাক্ট হয়ে থাকে এবং অন্য কোনো কাজে আমরা মনোযোগ দিতে পারিনা।

সব থেকে অধিক বিভ্রান্ত বা ডিস্ট্রাক্ট আমরা মোবাইলে চলে আশা নোটিফিকেশন (notification) গুলোর থেকে হয়ে থাকি।

মোবাইলে সব সময় কিছু না কিছু নোটিফিকেশন আসতেই থাকে, আর নোটিফিকেশন টোন শুনার সাথে সাথে আমরা সেটা না দেখে থাকতে পারিনা।

আর এভাবেই মোবাইলের ফলে আমরা অন্যান্য কোনো কাজ করতে থাকলে সেই কাজের থেকে বার বার বিভ্রান্ত হয়ে যাই।

আমলের মনোযোগ নষ্ট হওয়াঃ

মহান আল্লাহ তা’আলা আমাদের সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদত করার জন্য। কোরআনুল কারিমের শুরু সূরা ফাতিহা দ্বারা। উক্ত সূরার এক আয়াতে আল্লাহ বলছেন–

‘আমরা শুধু মাত্র তোমার ই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি'[5]।

অর্থৎ আল্লাহ তা’আলা ইবাদতের গুরুত্ব দিয়েই কোরআনের আলোচনা শুরু করতে পছন্দ করেছেন। এছাড়াও আরো ৯৫ টি আয়াতে আল্লাহ সুবহানাল্লাহু ত'আলা বারবার ইবাদতের গুরুত্ব বুঝানোর চেষ্টা করেছেন।

বর্তমানের প্রযুক্তির বিকাশ যেমন আমাদের ইলম অর্জনের মাধ্যম কে সহজ করে দিচ্ছে একই ভাবে আমাদেরর আমলের মনোযোগ ও নষ্ট করছে। অধিক সময় ফোন ব্যাবহার করার কারনে আমরা আমলের সময় কম পাচ্ছি। আবার কখনো কখনো নামাজ রত অবস্থায় বা কোআরন পাঠকৃত অবস্থায় ফোন,নোটিফিকেশন আসার দরুন আমাদের মনোযোগ নষ্ট হচ্ছে। কখনো আবার রাত জেগে ফোন ব্যাবহার করার কারনে আমাদের ফজর সালাহ বা তাহাজ্জুদের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ছুটে যাচ্ছে।

স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা

দেখুন যদি আপনি অতিরিক্ত পরিমানে মোবাইল ফোন ব্যবহার করছেন, তাহলে অবশই আপনার স্বাস্থ্যে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

যখন আপনি ঘন্টার পর ঘন্টা মোবাইল ফোন ব্যবহার করবেন তখন স্বাস্থ্যের সাথে জড়িত বিভিন্ন ধরণের সমস্যা গুলো দেখতে পাবেন।

---

[5]sura fatiha

যেমন, ঘুমের অভাব, মাথা বেথা, চিড়চিড়ে ভাব, রাগ ভাব, মন ভালো না লাগা এবং অনেক ক্ষেত্রে তো ডিপ্রেশন এর মতো সমস্যা গুলো দেখা দিয়ে থাকে।

আজকাল, রাত্রে ঘুমানোর আগে আমরা মোবাইলের স্ক্রিনে ঘন্টার পর ঘন্টা তাকিয়ে থাকি, গেম খেলি, ভিডিও দেখি, চ্যাটিং করি বা ইন্টারনেট ব্যবহার করি।

আর তাই, রাতের ভাবে ঘুম নষ্ট করে অত্যাধিক পরিমানে মোবাইলের স্ক্রিনে তাকানোর ফলে আমাদের ব্রেইন (brain) পর্যাপ্ত পরিমানের বিশ্রাম (rest) পেতে পারেনা।

আর এর ফলে, anxiety, anger, depression, stress ইত্যাদির মতো lifestyle disorder গুলো আমাদের মধ্যে চলে আসতে পারে।

দুর্ঘটনা হওয়ার সুযোগ :

আজকাল প্রোটেক দ্বিতীয় ব্যক্তিকে মোবাইলে কথা বলে বলে বইক বা গাড়ি চালিয়ে ভ্রমণ করা দেখা যায়।

আর এই মোবাইলে কথা বলে বলে বা গান শুনে শুনে গাড়ি চালানোর ফলে রাস্তার ওপরে সম্পূর্ণ ধ্যান থাকেনা।

এটাই কারণ যার ফলে রাস্তাঘাটে প্রচুর বইক এবং গাড়ির দুর্ঘটনা গুলো দেখতে পাওয়া যায়।

এমনিতে মোবাইলে কথা বলে বলে গাড়ি চালানো প্রায় প্রত্যেক দেশেই একটি অপরাধ যার জন্য ট্রাফিক বিভাগ দ্বারা টাকা ফাইন নেওয়া হয়।

তবে, এই মোবাইলে কথা বলে গাড়ি চলানোর ফাইন বা শাস্তি গুলো থাকা সত্ত্বেও এখনো এই ধরণের ভুল লোকেরা করছেন।

এছাড়াও, অনেকেই আছেন যারা রাস্তাঘাটে হাটা চলা করার সময় বা রাস্তা পার করার সময় নিজের মোবাইলের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

আর এটাও পথ দুর্ঘটনা হওয়ার একটি অনেক বড় কারণ হিসেবে দেখা যাচ্ছে।

অতিরিক্ত সময় নষ্ট হওয়া :

অবশই, মোবাইল ফোন এর ফলে আমাদের সময় গুলো কিভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেটা আমরা বুঝতেই পারছিনা।

কেননা, কিছু ভালো কাজ করা, নিজেকে ভবিষ্যতের জন্য তৈরি করা, পড়াশোনা করা, নতুন স্কিল শিখা ইত্যাদি এই ধরণের কাজ গুলো করলে আমাদের সময় গুলো কাজে এসেছে বলে বলা যেতে পারে।

তবে, যদি আপনি দিনের অধিক সময় মোবাইলে গেম খেলে, সিনেমা দেখে, সোশ্যাল মিডিয়াতে চ্যাটিং করে, ইউটিউব এর মধ্যে ভিডিও দেখে, ইন্টারনেট ব্যবহার করে কাটিয়ে দিচ্ছেন, তাহলে অবশই আপনার সেই সময় গুলো নষ্ট হওয়া ছাড়া কিছুই হচ্ছেনা।

মনে রাখবেন, মোবাইল এর মাধ্যমে সেই নষ্ট করা সময় গুলো আপনি কিন্তু আর কখনো ঘুরিয়ে পাবেননা।

আপনি চাইলে দিনের বেশিরভাগ সময় নতুন কিছু শিখার জন্য বা নিজের কাজ বা পড়াশোনাতে লাগিয়ে সেই সময়ের উপযুক্ত ব্যবহার অবশই করতে পারতেন।

তবে, মোবাইলের ব্যবহার করাটা একেবারেই খারাপ বলে আমি বলছিনা।

কিন্তু, যেকোনো জিনিস এর ব্যবহার প্রয়োজন হিসেবেই করা দরকার।

নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তা :

আজকাল যখন আমরা প্রায় বিভিন্ন জরুরি কাজ গুলোর জন্য একটি মোবাইলের ওপরে নির্ভর করে থাকছি তখন নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তা নিয়েও একটি প্রশ্ন অবশই চলে আসছে।

আমরা দিনে রাতে মোবাইল ফোন ব্যবহার করে থাকি এবং বিভিন্ন ব্যক্তিগত photos, images, videos, file, document, bank details ইত্যাদি মোবাইলে save করে রাখি।

এক্ষেত্রে, যদি আপনার মোবাইল হারিয়ে যায় বা চুরি হয়ে যায় তখন আপনার সেই জরুরি আর্থিক বিবরণ, ফটো বা ভিডিও ইত্যাদি অন্যের হাতে পড়ার ভয় থেকে যাচ্ছে।

মোবাইল ফোনের এই ক্ষতিকর দিকটির কারণে অনেকেই অনেক ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হয়েই থাকেন।

এছাড়া, আজকাল আমরা আমাদের মোবাইলে বিভিন্ন ধরণের apps গুলো ব্যবহার করে থাকি।

আর মনে রাখবেন, এরকম প্রচুর mobile apps গুলো রয়েছে যারা আপনার mobile থেকে জরুরি ডাটা (data) এবং files গুলো চুরি করে নিতে পারে।

তাই, মোবাইল ফোন ব্যবহার করার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তার বিষয়টি নিয়ে একটি প্রশ্ন অবশই থেকে যাচ্ছে।

কাজে মন না বসা :

অবশই যখন অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহার করার একটি অভ্যেস আমাদের হয়ে যায় তখন এর ফলাফল স্বরূপে প্রচুর সমস্যা গুলো দেখা দিয়ে থাকে।

আর ধীরে ধীরে মোবাইলের প্রতি আমাদের আকর্ষণ এতটাই বেড়ে যায় যে আমরা কোনো কাজেই মন দিতে পারিনা।

বা, যদি কোনো কাজ মন দিয়েও করতে চাই, সেক্ষেত্রেও আমাদের মন বার বার মোবাইলের দিকে চলে যায়।

আপনি নিজের দপ্তরে কাজ করার সময় কয়বার মোবাইলের দিকে চোখ দিয়ে থাকেন ?

নতুন কি কি নোটিফিকেশন আসলো ? সোশ্যাল মিডিয়াতে কোনো বন্ধু এসএমএস দিলো কি না ? নতুন কি ভিডিও নোটিফিকেশ পেলাম ?

এই প্রত্যেকটি প্রশ্ন আমাদের মনে ঘুরতে থাকে যার ফলে আজকাল দপ্তরেও লোকেরা বার বার মোবাইল ব্যবহার করা দেখা যায়।

আর এর ফলে, আমাদের কার্যক্ষমতা দিনের পর দিন কমে আসছে এবং কাজে কম বসছেনা।

পড়াশোনায় মন না বসা :

কোরআনুল কারীমের প্রথম নাজিলকৃত আয়াত ছিলো সূরা আলাকের প্রথম ৫ টি আয়াত।

اِقْرَاْ بِا سْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ

ইকরা বিছমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক।

"পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন"

(QS. Al-'Alaq 96: Verse 1)

আল্লাহ এই আয়াত দিয়ে কোরআন নাজিল করেছেন। তার মানে তিনি ইলম অন্বেষন কে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। জীবনে ও আখেরাতে সফল হওয়ার জন্য ঈলমের গুরুত্ব অনেক। কিন্তু অতিরিক্ত মোবাইল আসক্তি আমাদের ইলম অন্বেষণ থেকে দূরে রাখছে।

কেননা, ছাত্ররা তাদের বেশিরভাগ সময় মোবাইলে গেম খেলতে, কথা বলতে, সোশ্যাল মিডিয়াতে চ্যাটিং করতে ইত্যাদি অন্যান্য বিভিন্ন কাজে নষ্ট করে থাকে।

হে, বর্তমান সময়ে পড়াশোনার ক্ষেত্রে একটি মোবাইল ফোন ব্যবহার করার সুবিধা এবং উপকারিতা প্রচুর রয়েছে।

তবে, যতটা উপকার হচ্ছে তার থেকে যদি উপকার বা ক্ষতি হয়ে থাকে তাহলে সেই উপকারের লাভ কি।

মোবাইল এর প্রতি নেশা :

অবশ্যই আপনি ঠিকই শুনছেন, আজকাল একটি মোবাইলের মধ্যে সব রকমের সুবিধা আমরা পেয়ে থাকি।

গান শুনা, গেম খেলা, সিনেমা দেখা, ইন্টারনেট এর ব্যবহার, এপ্লিকেশন গুলোর ব্যবহার ইত্যাদি।

এছাড়া, আজকাল সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার করে এবং অনলাইন ওয়েব সিরিজ গুলো দেখে সময় কাটানোটা একটি সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মোট কথা, একটি smartphone ব্যবহার করে আরামে সময় কাটানোর প্রচুর আলাদা আলাদা উপায় আমাদের কাছে থাকে।

আর এটাই কারণ যার জন্য মোবাইল ফোনের ব্যবহার আজ প্রায় প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এক নেশার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আপনি কেবল এক দিন মোবাইল ছাড়া থাকার চেষ্টা করে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে কিভাবে আপনিও এই নেশাতেই ভুগতভুগী হয়ে রয়েছেন।

ফ্রড (fraud) হওয়া :

আজকাল মোবাইলের মাধ্যমে প্রচুর ফ্রড কাজ গুলো করা হয়।

যেমন, ভুলভাল বলে আপনার ব্যাংক এর তথ্য সংগ্রহ করে ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নেওয়া ইত্যাদি।

এছাড়া, এখনের আধুনিক সময়ে বিভিন্ন লোকেদের email বা inbox এর মধ্যে বিভিন্ন fake offer এর message পাঠিয়ে টাকা আদায় করার চেষ্টা করা হয়।

অতিরিক্ত খরচ :

আগেকার মোবাইল ফোন গুলো ছিল অনেক সাধারণ এবং কেবল সীমিত features এবং functions সেখানে থাকতো।

কিন্তু এখন হলো স্মার্টফোনের সময় যেখানে কিছুদিন পর পর নতুন নতুন features, functions এবং updates এর সাথে মোবাইল গুলোকে বাজারে ছাড়া হয়।

এক্ষেত্রে, একটি মোবাইল কেনার প্রায় ২ থেকে ৩ মাস পর তার থেকে অধিক ভালো মোবাইল বাজারে চলে আসছে।

আর উন্নত, ভালো এবং অধিক ফিচার থাকা মোবাইল কেনার উদ্দেশ্যে বার বার লোকেরা প্রচুর টাকা খরচ করে মোবাইল গুলো কিনেন।

এছাড়া, আজকাল মোবাইলের মাধ্যমে মোবাইল ব্যাংকিং এর সুবিধা রয়েছে।

তাই, যেকোনো সময় টাকা পাঠানো, অনলাইন পেমেন্ট, অনলাইন শপিং করা ইত্যাদি আমাদের হাতের মুঠোয় রয়েছে, যার জন্য খরচ প্রচুর বেড়ে গেছে।

কম্পিউটারঃ মোবাইলের মতো কম্পিউটার ও বিজ্ঞানের এক অন্যতম সৃষ্টি। মোবাইল ও কম্পিউটারের ব্যাবহার মাধ্যম গুলো একই হওয়াতে এদের উপকারীতা ও অপকারিতা একই রকম।

ইন্টারনেটঃ ডিভাইসের পর প্রযুক্তির নতুন আরেকটি বিবর্তন হলো ইন্টারনেট। যা সমস্ত বিশ্বকে নিয়ে এসেছে হাতের মুঠোতে।এর ভালো দিক অনেক। তবে খারাপের সংখ্যাও কম নয়। ইন্টার নেট কে কেন্দ্র করেই আমরা যোগাযোগ মাধ্যম গুলোতে এক্টিভ হতে পারি। যেখানে আমরা প্রতিনিয়ত প্রতারনায়

পড়ছি। বিপদে পড়ছি নানা ভাবে। এছাড়া ঈমান হারাচ্ছি খুব সহজেই। আমরা এখন এই প্রতারনার কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

এটা বিশ্বকে একই নেটওয়ার্কের মধ্যে এনেছে। এটাও অপব্যবহারের শিকার। ফলে এই প্রযুক্তির কুফলও অধিক। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে কিশোররাও সহজেই পর্ণোগ্রাফীতে নিমজ্জিত হচ্ছে। এর খারাপ প্রভাব পড়ছে কিশোরদের মন-মগজে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন অশ্লীল অডিও, ভিডিও প্রচারের ফলে অশ্লীলতার ব্যাপক ছড়াছড়ি হচ্ছে। ফলে নারীর শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ, ইভটিজিং, এসিড সন্ত্রাস, হত্যা-গুম ইত্যাদি বৃদ্ধি পেয়েছে।

তাই প্রযুক্তির অবদানকে খুব কম মানুষই সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারছে। আগে এসব ঈমান বিধ্বংসী বিষয়গুলো বিরল ছিল। কিন্তু ইন্টারনেটের কল্যাণে তা হাতের মুঠোয় এসেছে। কিছুদিন আগের এক জরিপে জানা যায়, বিপুল সংখ্যক স্কুল শিক্ষার্থীরা পর্ণোগ্রাফীর সাথে জড়িত। এছাড়া স্মার্ট ফোনের ওয়াইফাই শেয়ারিং (shareit, anyshare etc.) ও ব্লুটুথের (Bluetooth) মাধ্যমে এক মোবাইল থেকে অন্য মোবাইলে সহজেই তা ছড়িয়ে যাচ্ছে। পরিবারের প্রধানদের যথাযথ মনিটরিং-এর অভাবে এগুলো আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে।



২১ শতকের শুরু থেকে বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেট ব্যবহারের এক বিস্ফোরণ সূচিত হয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী শতকোটিরও বেশি মানুষ প্রত্যক্ষভাবে ইন্টারনেটের সঙ্গে সংযুক্ত। আজ থেকে ৪ বছর আগে তথা ২০১৪ সালের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী কেবল আমেরিকায় প্রতিটি মানুষ সারা মাসে গড়ে ২৭ ঘন্টা ইন্টারনেট ব্রাউজিং করে সময় ব্যয় করে। আর সারা মাস হাতের মোবাইল ফোনের ওপর ব্যয় করে ৩৪ ঘন্টা।

ইন্টারনেট সমগ্র পৃথিবীকে আমাদের হাতের মুঠোই এনে দিয়েছে। ঘরে বসেই আমরা সারা পৃথিবীকে অবলোকন করছি। ইন্টারনেটে অনেক ভাল দিক রয়েছে যা ব্যবহারের ফলে আমাদের জানার পরিধি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এর খারাপ দিক মোটেই উপেক্ষা করার মত নয়। পর্নোগ্রাফি তেমনই একটি খারাপ দিক যা শিশুসহ যুবক-যুবতীদের ঠেলে দিচ্ছে ভয়াবহ বিকৃতির দিকে। অশ্লীল ভিডিও দেখার ফলে একজন তরুণ হয়ে উঠছে সেক্স অপরাধী। এতে তরুণ-তরুণীদের স্বাভাবিক কর্মতৎপরতা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। এ পরিস্থিতি আমাদের দেশের জন্য, আগামী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে, আমাদের সমাজ কাঠামোর জন্যে ভয়াবহ অভিশাপ ও হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা যদি আমাদের দেশটাকে এগিয়ে নিতে চাই তবে তরুণ সমাজকে অবশ্যই নৈতিকতার মান দন্ডে উত্তর্ন হতে হবে।বিভিন্ন সাইবার ক্যাফের উপর পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে সময়ে তরুণদের পড়ার টেবিলে অথবা খেলার মাঠে থাকার কথা অথচ সে সময়ে তারা নিমগ্ন থাকছে ইন্টারনেটে। তারা যেসব সাইট ব্রাউজ করে তার বেশিরভাগই পর্নোসাইড। যেখান থেকে অবাধে পর্নোছবি ডাউনলোড করা যায় মোবাইলে। পর্নোগ্রাফি ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে বেড়েছে মাদকাশক্তি। পর্নোগ্রাফিতে আসক্তরা মাদকাসক্তসহ মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত হচ্ছে। বেশিরভাগই স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী। এরা লেখাপড়ায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। একপর্যায়ে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। এসবের জন্য অর্থ জোগাতে চুরি, ছিনতাই, ডাকাতিসহ নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়ছে।ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায়, আবু বকর (রা.) যখন খলিফা তখন তার সন্তান আবদুর রাহমান বিন আবু বকরকে তিনি এমনভাবে লালন-পালন করেন যে, অধিকাংশ মানুষ তাকে চিনতোই না। উমার বিন খাত্তাব (রা.) যখন খলিফা হিসাবে মৃত্যু শয্যায় তখন তার পুত্র আব্দুল্লাহ বিন উমারের নাম উল্লেখ করে বলে যান, তাকে তোমরা পরবর্তী খলিফা কে হবে সে মত দেবার জন্য রাখতে পারো কিন্তু সে খলিফা হতে পারবে না। উমার বিন আব্দুল আজীজ (রহ.) যখন কিশোর তখন তার বাবা আবদুল আজীজ (রহ.) ছিলেন সিরিয়ার মতো বিরাট প্রদেশের গভর্নর। তিনি ছেলেকে মদীনায় পাঠিয়ে দেন শিক্ষা গ্রহণের জন্য এবং শিক্ষককে বলে দেন, আল্লাহর শপথ, যদি গভর্নরের সন্তান হিসাবে তার প্রতি কোন পক্ষপাত আপনি করেন তাহলে আল্লাহর কাছে আপনাকে আমি দায়ী করব। একজন মুসলমানের রয়েছে ধর্মীয় নির্দেশনা। যে নির্দেশনার আলোকে প্রত্যেক মুসলমান চলতে বাধ্য। আনন্দ-ফুর্তি করা যাবে কিন্তু তা অবশ্যই পরিচ্ছন্ন হতে হবে। মদ, জুয়া, জিনা-ব্যভিচার, অশ্লীলতা ইসলাম সহ্য করে না। যে আনন্দ অন্যের অধিকার, শান্তি, সুখ ও সতীত্বকে কেড়ে নেয় এমন সংস্কৃতিকে ইসলাম ধিক্কার জানায়।পর্নগ্রাফি আর মাদক হাতের নাগালে হওয়ার কারণে যেমন অপরাধপ্রবণতা বাড়ছে তেমনি সামাজিক অস্থিরতাও বাড়ছে। পুলিশের কর্তারাও বলছেন, ‘পর্নোগ্রাফি উৎসাহ দিচ্ছে ধ্বংসে, এটি আমাদের সমাজের জন্য অভিশাপ। শুধু শিক্ষার্থী নয় রিকশাচালকসহ বিভিন্ন শ্রমজীবীদের মোবাইলেও বিস্তার ঘটেছে এটি।’ টুইটারে প্রতিদিন কম করে হলেও ৫ লাখ পর্নো ছবির দেখা মিলছে বলে ডেইলি স্টারের এক প্রতিবেদনে বলা হয়। পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সমাজ বিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী ও অভিভাবকরা।রাজনৈতিক আগ্রাসনের চেয়ে সংস্কৃতির আগ্রাসন চরম মারাত্মক। রাজনৈতিক সংঘাত হলে দেখা যায় হইচই, ডামাডোল আর সাংস্কৃতিক আগ্রাসন কোন জাতিকে নিঃশেষ করে দেয় অতি গোপনে তিলে তিলে। সংস্কৃতিক আগ্রাসন হচ্ছে অ ারপঃড়ৎু রিঃযড়ঁঃ ধিৎ। এই অদৃশ্য যুদ্ধের সৈনিক হচ্ছে কিছু দেশী-বিদেশী ভাড়াটিয়া (পেইড এজেন্ট) সাংস্কৃতিক কর্মী, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও মিডিয়া। তারা এদেশের সকল সম্ভাবনা কুরে কুরে নষ্ট করতে চায়। আর আমাদের দেশের এনজিওরা এদেশের নারীদের শেখায়, ‘কিসের বর, কিসের ঘর। দেহ আমার, সিদ্ধান্ত আমার।’ গভীর রাত পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা জম্পেশ আড্ডা দিয়ে

রোমান্টিক আলোর মূর্ছনায় সেবন করছে মাদক। কিছু বিকৃত নব্যবিত্তবানদের জন্য উঁচু শ্রেণীর ক্লাবগুলো যেন নিরাপদ ও শান্তিতে অনাচার ও মদ্যপানের অভয়াশ্রম! আধিপত্যবাদের এই নগ্ন থাবা আমাদের সংস্কৃতি, সাহিত্য, জাতীয় আদর্শ ও জাতীয় ঐতিহ্য ও ঐক্যেও সবচেয়ে বড় বাধা।আজকে তরুণ সমাজের যে অবক্ষয় তার অনেকাংশই এই যথেচ্ছা ইন্টারনেট ব্যবহারের কুফল। বিশ্বের অনেক দেশেই এর কুপ্রভাব থেকে বাঁচতে ১০/১২ বছর আগে থেকেই অশ্লীল, অসামাজিক ক্ষতিকর সাইট ব্লক করার ব্যবস্থা নিয়েছে। না চাইতেও স্ক্রিনে অশ্লীলতার লিঙ্ক চলে আসা বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু আমরা ঠিকই চলছি নিয়ন্ত্রণহীন গতিতে। আইটি প্রফেশনালদের অভিমত হলো কাজটি করতে হবে রাষ্ট্রের। বিটিআরসির নিজস্ব যে যন্ত্রপাতি আছে তা দিয়ে পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হলেও তারা তা করছে না। বিটিআরসির দাবি, বিষয়টি আইনি সিদ্ধান্তের ব্যাপার। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, ওয়েবসাইট বন্ধ করার আইনগত ক্ষমতা বিটিআরসির যদি নাও থাকে সেই ক্ষমতাটা অর্জন করা তার কর্তব্য।ইন্টারনেট যেমন জগৎটাকে আমাদের হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে তেমনি তা আমাদের মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, মেধা, আমাদের প্রজন্ম, ভবিষ্যৎ নষ্টের জন্য মহা হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের শিশু, কিশোর, পুত্র, কন্যারা ইন্টারনেট সার্ফিং ও ব্রাউজে চাইতে না চাইতেই স্ক্রিনে অশ্লীলতার লিঙ্ক চলে আসছে। এতে তার কোমলমতি মস্তিষ্ক বিকারগ্রস্ত হওয়াসহ অশ্লীল, নোংরা ও নষ্ট সংস্কৃতি তার স্বাভাবিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।
মনোবিজ্ঞানীদের মতে, ইন্টারনেট ব্যবহারকারী তরুণদের মধ্যে মানসিক অস্থিরতা বাড়ছে। অশ্লীল বিষয়গুলো খোঁজা এবং সেগুলো পড়া ও দেখার বিষয়গুলোকে শুধু আইন করে বন্ধ করা যাবে না বলে মনে করছেন কম্পিউটার প্রকৌশলীরা। দুর্গন্ধের ভয়ে জানালা বন্ধ করা যাবে না। সুগন্ধ চিনতে পারার সাথে সুগন্ধ নেওয়াটাই প্রকৃত সচেতনতার কাজ। কিন্তু কথা হলো- যার সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ চেনার বয়স হয়নি ভাবনা তো তাদের নিয়েই। এ জন্য দরকার সন্তানদের পারিবারিকভাবে কঠোর পর্যবেক্ষণ, ধর্মীয় অনুশাসন ও সামাজিক প্রতিরোধ। এক হাদিসে আছে, 'কোনো বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া চোখের যিনা, অশ্লীল কথা বলা জিহ্বার যিনা, স্পর্শ করা হাতের যিনা, ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে হেঁটে যাওয়া পায়ের যিনা, খারাপ কথা শোনা কানের যিনা আর যিনার কল্পনা করা মনের যিনা' (বুখারি)। মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি যেনা করে কিংবা মদ পান করে, আল্লাহ তার কাছ থেকে ঈমান ছিনিয়ে নেন, যেভাবে কোন ব্যক্তি তার জামা মাথার উপর দিয়ে খুলে ফেলে'। এ হাদিসের মর্ম কথা হলো যেনা করার পরিণতি হলো ঈমানহারা হওয়া। এটা এমন একটা জঘন্য পাপ যে, মানুষ যখন তা করে আল্লাহ তা'আলা মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ ঈমানকেই নিয়ে নেন। নিঃসন্দেহে এ কয়েক বছরে এ হার দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। ইন্টারনেটের ব্যবহার ব্যাপকহারে বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এর নেতিবাচক বা খারাপ প্রভাবগুলো সামনে উঠে আসছে আরও স্পষ্টভাবে। এসব নেতিবাচক প্রভাব মানুষকে দৈহিক, মানসিক এবং আবেগের দিক দিয়ে চিরস্থায়ী ক্ষতি সাধন করছে। অতিরিক্ত ইন্টারনেটের ব্যবহার কী কী নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে তা বলতে গেলে, নিচের বিষয়গুলো আগে উঠে আসবে।

সৃজনশীলতার ঘাটতি : ইন্টারনেটের শুরুর দিকে মার্ক জাকারবার্গ যেমন ফেসবুকের মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বানিয়ে চরম সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনই তার আইডিয়া চুরি করা মানুষের অভাব নেই। এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা তাদের সৃজনশীলতা দিয়ে ইন্টারনেটে কনটেন্ট ডেভেলপ করছে। আবার আরেক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা এসব কনটেন্ট চুরি করে নিজের নামে

চালিয়ে দিচ্ছে। যা আসল কনটেন্ট ডেভেলপারকে নিরাশ করছে নতুন কিছু বানানো থেকে। ইন্টারনেটে এত বেশি তথ্য রয়েছে যে মানুষকে নতুন করে আর ভাবতেই হচ্ছে না। শিক্ষার্থীদের ভাবনার দরজা ইন্টারনেট পর্যন্তই থেমে যাচ্ছে, তাদের নতুন করে নিজে নিজে চিন্তা করে উত্তর আবিষ্কার করতে হচ্ছে না।

চুরি করা বড় অন্যায়। ইসলাম চুরি করাকে হারাম বলেছে। মহান আল্লাহ বলেন, তোমরা অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ কর না। সূরা বাকারা, সূরা নং-১, আয়াত নং ১৮৭। চুরি জঘন্য অপরাধ। মানুষ যখন এ অপরাধে লিপ্ত হয় তখন তার ঈমান-ই থাকে না। হাদিস শরিফে এসেছে, হজরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, ব্যভিচারী যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তখন সে মুমিন থাকে না এবং চোর যখন চুরি করে তখন সেও মুমিন থাকে না।

মানুষ যেন এ পাপ থেকে দূরে থাকে এজন্য ইসলামী শরিয়তে কঠোর শাস্তির বিধান দেয়া হয়েছে। কোরআন শরিফে বর্ণিত হয়েছে, চোর পুরুষ বা নারী হোক, তাদের হাত কেটে দেবে। এটা তাদের পাপের শাস্তি। এ দণ্ড আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। সূরা মাইদাহ, সূরা নং-৪, আয়াত নং-৩৭। যেসব দেশে এ বিধান কার্যকর করা হয়েছে, সেখানে চৌর্যবৃত্তি নেই। চোরের উপদ্রব থেকে মানুষ রক্ষা পেয়েছে। এ বিধান সব মানুষের জন্য প্রযোজ্য। ধনী পরিবারের কেউ এর বাইরে নয়। ইসলামী বিধিমতে সমাজের যে কেউ এ কর্মে লিপ্ত হবে তাকেই এ শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। হোক সে প্রধানমন্ত্রী বা তার পুত্র। এ প্রসঙ্গে হাদিস শরিফে এসেছে, হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, বনু মাখযুম গোত্রীয় এক মহিলা চুরি করেছিল। এতে কুরাইশরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। তারা বলাবলি করে, কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ ব্যাপারে সুপারিশ উত্থাপন করবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় পাত্র উসামা ইবন যায়দ (রা.) ছাড়া আর কে এ সাহস করবে? তারপর উসামা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ ব্যাপারে আলোচনা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি আল্লাহর দণ্ডবিধিগুলো থেকে এক দণ্ডের ব্যাপারে সুপারিশ করছ? তারপর তিনি দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্বেকার লোকদের নীতিও ছিল যে, যখন কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করত, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন তাদের মধ্যে কোনো দুর্বল ব্যক্তি চুরি করত, তখন তার ওপর দণ্ড প্রয়োগ করত। আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মদ (সা.)-এর কন্যা ফাতেমাও চুরি করে, তাহলে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দেব।বুখারি, ৪৩৭৯ ও মুসলিম নং-৩৫৯৮।

কোনো কোনো দেশের সংবিধানে চুরির অপরাধের জন্য গুটিকয়েক বছরের সাজার বিধান রয়েছে এবং সে সাজাও তৎক্ষণাত হয় না। হয় মামলা হওয়ার পর। মামলাও কোনো কোনো সময় গ্রহণ হয় না যদি না বড় কোনো কাগজে সে সম্বন্ধে রিপোর্ট হয়। মামলার বিচার ঝুলে থাকে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। যদি না সেখানে বড় রকমের আর্থিক লেনদেন হয়। এভাবে দেখা যায় চুরির মতো একটি জঘন্য অপরাধের মামলার রায়ও অপরাধীর সাজা হতে বছর দশেক সময় লেগে যায়। ফলে তৎক্ষণাত এ সাজা না হওয়ার কারণে সমাজে এ বিচারের কোনো প্রভাব পড়ে না। মানুষ চুরি করতে ভয় পায় না। তার চিন্তা হয়, কিছু খরচ করলে হয়তো রক্ষা পাওয়া যাবে। পূর্ববর্তীকালে যখন মুসলিম খলিফারা এ আইনটি বাস্তবায়ন করেছেন, তখন তাদের সমাজ হয়েছিল সোনালি সমাজ।

সাইবার বুলিয়িং : এখানে বুলিয়িং বলতে বোঝায় অবমাননা করা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা। কোনো মানুষকে বাস্তবে বা সামনাসামনি অবমাননা ও খারাপ মন্তব্য করার চেয়ে ইন্টারনেট তথা বিভিন্ন

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে করা অনেক সহজ। সামাজিক মাধ্যমে বিভিন্ন তারকারা এ সাইবার বুলিয়িংয়ের সবচেয়ে বড় শিকার।



অনলাইনে সাইবার বুলিয়িংয়ের শিকার একজন ব্যক্তি খারাপ মন্তব্য বা মতামতের কারণে অপমানিত–অপদস্থ বোধ করেন। সাইবার বুলিয়িংয়ের শিকারে আত্মহত্যা পর্যন্ত ঘটে থাকে। বুলিং হলো তিক্ত বা কটু কথা। সাইবার বুলিং মানে কোনো ব্যক্তিকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হেয় প্রতিপন্ন করার অয়োজন; যা ভীতি ও মানসিক চাপ সৃষ্টি করে, অর্থ হাতিয়ে নেয় ও অনৈতিক কাজে বাধ্য করে। ইন্টারনেটের জোয়ারে গা ভাসিয়ে ক্ষণিকের জন্য আনন্দ অনুভব করলেও, অসচেতন ব্যবহারকারী নিজের জীবনে ডেকে আনে ঘোর অন্ধকার। মুহূর্তেই গোপনীয় সব কর্মকাণ্ডের চিত্র ভাইরাল হয়ে, ব্যবহারকারীর কাছে পৃথিবীর আবহাওয়া তিক্ত ও বিষাদে ভারী হয়ে আসে। অনেকেই হতাশার কালো ছায়ায় ডুবে আত্মহত্যার পথ ধরে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘আর তোমরা নিজেরা নিজদের হত্যা করো না।’ (সূরা নিসা, আয়াত–২৯)

[6]
সাইবার বুলিং একটি জঘন্য অপরাধ। সাইবার অপরাধ ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবের চেয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে আঘাত করে, যার ফলে জীবন হয়ে পড়ে তুফানের কবলে পড়া নৌকার মাঝির মতো। নৌকার মাঝি হাল শক্ত হাতে ধরে নিজেকে শঙ্কামুক্ত করলেও, সংশোধনের চেষ্টায় মানুষের সাথে কঠোরতার প্রদর্শন করলে, সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে। কিন্তু ভালোবাসার চাদরে আবৃত করে, আঁধার গুছিয়ে দেয়া যায়; খুব সহজে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর ভালো ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দকে প্রতিহত করো তা দ্বারা যা উৎকৃষ্টতর, ফলে তোমার ও যার মধ্যে শত্রুতা রয়েছে সে যেন হয়ে যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু।' (সূরা হা-মিম, আয়াত-৩৪)

[7]
ডায়েটবিহীন প্রযুক্তির ব্যবহার মানুষকে ঝুঁকিতে ফেলে দেয়। সুবিশাল মরুভূমিতে পথ হারালে মৃত্যু নিশ্চিত। একইভাবে ইন্টারনেটের অন্তহীন দুনিয়ার ফাঁদে আটকা পড়ে, বহু মানুষ হতাশার বাহুবাঁধনে বন্দী হয়ে, রৌদ্রের মাঝে এক ফালি মেঘ যেমন চঞ্চল ছুটোছুটি করে; সেই জীবন ছেড়ে হিমালয়ে শীতল হয়ে বসে থাকে। লোকলজ্জার ভয়ে কেউ আত্মহত্যায় সমাধান খুঁজে। করোনা মহামারীতে গৃহবন্দী হয়ে হাজার হাজার তরুণ-তরুণী নিজেদের আত্মনিয়ন্ত্রণহীন হয়ে অদৃশ্য খাদে পড়েছে। নিজেদের আত্মার উন্নয়নের জন্য আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে।' (সূরা আনকাবুত, আয়াত-৪৫)[8]

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক, মেসেঞ্জার, টুইটার, ভাইবার, হোয়াটসঅ্যাপ হাতড়ে কূলে ভিড়বার ফুরসত অনেকের হয় না, তার আগেই হারিয়ে যায় সমুদ্রে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের হিসাব মতে, দেশের তিন-চতুর্থাংশ নারীই সাইবার বুলিংয়ের শিকার। ইউনিসেফের সাম্প্রতিক জরিপ অনুযায়ী, সাইবার বুলিংয়ের শিকার হওয়া ৩৮ শতাংশ ১০-১৩ বছর বয়সের, ৩৬ শতাংশ ১৪-১৫ বছর এবং ১৬-১৭ বছর বয়সী ২৫ শতাংশ। এর আগে তরুণ-তরুণীদের মধ্যেই কিছুটা সীমাবদ্ধ থাকলেও, বর্তমানে করোনা মহামারীর সাথে পাল্লা দিয়ে সাইবার বুলিং আঘাত করেছে, রঙে ভরা যৌবন থেকে শুরু করে মরীচিকা ধরা বৃদ্ধকে।
বক পাখির মতো লক্ষ্যবস্তু ঠিক করে দুর্বল স্থানে আঘাত করে, মেসেজ, ই-মেইলে বাক্যবিস্ফোরণ, অশ্লীল ছবি বা ভিডিও প্রেরণ করে; বয়সে কাঁচা তরুণীদের অনেকেই দেখা মাত্র চোখ রক্তবর্ণ ধারণ করে। আবার অধিকাংশই আগ্রহী ও কৌতূহলপ্রবণ হয়ে ফাঁদে আটকা পড়ে। তারপর কখনো মানসিক চাপ সৃষ্টি করে, আপত্তিকর প্রস্তাব ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রলুব্ধ হতে বাধ্য করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নিশ্চয় যারা এটা পছন্দ করে যে, মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব।

আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না।' (সূরা নূর, আয়াত-১৯)[9]

---

[6]সূরা আন নিসা, ২৯
[7]sura haa meem 34

[8]sura ankabut 45
[9]sura noor 19

প্রযুক্তির উৎকর্ষ দিনে দিনে বেড়েই চলছে। আর মানুষের সব কাজে ইন্টারনেট-নির্ভর হয়ে পড়ছে। করোনায় মানুষ গৃহবন্দী হওয়ায় ইন্টারনেট ব্যবহার বেড়েছে বহুগুণে। সাইবার অপরাধীরা নতুন নতুন প্রতারণার ফাঁদ এঁটে বসে আছে, মানুষদের সহজে আকৃষ্ট করতে। ছুরির আঘাতে দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়, মুখের কথা অন্তরে আঘাত করে। কিন্তু লিখিত বাক্যব্যয় অন্তরকে রক্তাক্ত করে। অনেক প্রেমিক প্রেমের সম্পর্ক যাচাই করে, ফেসবুক পাসওয়ার্ড প্রদানে, অন্তরঙ্গ ছবি ও ভিডিও কলে লজ্জার মাথা খেয়ে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক-জাহেলি যুগের মতো সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না।' (সূরা আহজাব, আয়াত-৩৩)[10]

বিশ্ববাসীর জন্য সাইবার অপরাধ হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যান্য দেশে বহুমুখী রূপ ধারণ করলেও বাংলাদেশে তরুণ-তরুণীদের সাইবার অপরাধের শিকার হতে বেশি দেখা গেছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর মুসা যখন যৌবনে পদার্পণ করল এবং পরিণত বয়স্ক হলো, তখন আমি তাকে বিচারবুদ্ধি ও জ্ঞান দান করলাম। আর এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার দিয়ে থাকি।' (সূরা কাসাস, আয়াত-১৪)[11]

২০১৮ সালে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রণীত হয়। যেখানে সাইবার নিরাপত্তা আইন ১৪ ধারায় অপরাধের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বহু মানুষ আইনের ব্যাপারে সচেতন নয়। আইনের আশ্রয় নিয়ে নিজেকে সুরক্ষিত করার সৎ সাহস নেই বা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে দিন পার করে। এই সুযোগে অপরাধীরা আরো ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।সবার মনে রাখা উচিত, ওস্তাদের মাইর শেষ রাতে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর সামুদ সম্প্রদায়, আমি তাদেরকে সঠিক পথের নির্দেশনা দিয়েছিলাম; কিন্তু তারা সঠিক পথে চলার পরিবর্তে অন্ধ পথে চলাই পছন্দ করেছিল। ফলে তাদের অর্জনের কারণেই লাঞ্ছনাদায়ক আজাবের বজ্রাঘাত তাদেরকে পাকড়াও করল।' (সূরা হা-মিম, আয়াত-১৭)[12]

আধুনিক প্রযুক্তি আমাদের জীবনকে করেছে উন্নত ও সহজতর। ইন্টারনেটের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ও সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিতে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রত্যেকে নিজের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে প্রাণান্তকর লড়াই করে। কিন্তু অনেকেই অবচেতন মনে ইন্টারনেটে ঘোরাঘুরি করে, জীবন নৌকার ভরাডুবি ঘটায়; নিজেকে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করে।

[10] sura ahzaab 33
[11] sura kasas 14
[12] sura ha meem 17

আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘নিজ হাতে নিজদের ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না। আর সুকর্ম করো। নিশ্চয় আল্লাহ সুকর্মশীলদের ভালোবাসেন।’ (সূরা বাকারা, আয়াত-১৯৫[13])

যারা নিজেদের জঘন্য অপরাধ থেকে ফিরিয়ে আনতে চায়, আল্লাহ তায়ালা তাদের সুসংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘বলো, হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সব পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’ (সূরা জুমার, আয়াত-৫৩) হে আল্লাহ! আমাদের সাইবারের মতো জঘন্য অপরাধ থেকে নিজেদের মুক্ত রাখার তাওফিক দান করুন।

[13]sura bakara 195

হ্যাকিংঃ হ্যাকিং বর্তমানে একটি কমন ক্রাইম। একদল হ্যাকার আছে যারা কম দামে বিভিন্ন জিনিস বিক্রির লোভ দেখিয়ে বা ভুয়া লিংক দিয়ে মানুষের আইডি, পাসওয়ার্ড এমন কি ব্যাক্তিগত তথ্যা ও হ্যাক করে নেয়। এবং পরবর্তীতে টাকাপয়সা হাতিয়ে নেয় ব্যাংক থেকে বা মুক্তিপন আদায় করে ব্ল্যাকমেইল করে।

গ্লোবাল ভিলেজের মানচিত্রে তথ্য-প্রযুক্তিতে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলা প্রভাবশালী এক পরিবার। গ্লোবাল ভিলেজ বা বিশ্বগ্রাম হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিনির্ভর এমন একটি সামাজিক বা সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা, যেখানে পৃথিবীর সব প্রান্তের মানুষই একটি একক সমাজে বসবাস করে এবং আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে সহজেই তাদের চিন্তা-ভাবনা, সংস্কৃতি-কৃষ্টি ইত্যাদির মিথস্ক্রিয়াসহ একে অপরকে সহযোগিতা করে থাকে।



বিশ্বগ্রামে বিচরণের জন্য হার্ডওয়্যার বা কম্পিউটার-সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি (মোবাইল, টেলিফোন, স্মার্ট ওয়াচ), প্রগ্রামসমূহ বা সফটওয়্যার, ব্যক্তিবর্গের সক্ষমতা, ডাটা বা ইনফরমেশন, ইন্টারনেটে সংযুক্ততা ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। এই জিনিসগুলো ব্যবহারের মাধ্যমেই আমরা চিন্তার আদান-প্রদান করতে পারি। বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের খবর পেয়ে যাই মুহূর্তেই। কিন্তু এই ডিভাইস, সফটওয়্যার ইত্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এতে আমাদের ব্যক্তিগত অনেক তথ্য জমে যায় সেখানে। যেগুলো আমরা সাধারণত কারো সঙ্গে শেয়ার করতে চাই না। যদি কেউ এই তথ্যগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতে পারে, তবে সে খুব সহজেই আমাদের বিপদে ফেলে দিতে পারে। শুধু ব্যক্তিগত পর্যায়েই নয়, অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রেরও অনেক বড় ক্ষতি করে দিতে পারে। যারা এ ধরনের কাজগুলো করে তাদের আমরা চিনি হ্যাকার হিসেবে।

অন্যের গোপন তথ্য চুরি করা ইসলামের জঘন্যতম অপরাধ। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, কোনো চোর (পূর্ণাঙ্গ) মুমিন থাকাবস্থায় চুরি করে না। (মুসলিম, হাদিস : ১০৬)

বিশেষজ্ঞদের মতে হ্যাকারদের তিনটি শ্রেণি রয়েছে। হোয়াইট হ্যাট, গ্রে হ্যাট ও ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকার। এদের মধ্যে ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকার বেশ ভয়ংকর। যারা মানুষের তথ্য হ্যাক করে তাদের বিপদে ফেলে দেয়। এ ধরনের হ্যাকিং ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্ভ্রমহানি বা অন্য কোনো বিষয়ে জুলুমের জন্য দায়ী থাকে, সে যেন আজই তার কাছ থেকে মাফ করিয়ে নেয়, সেদিন আসার আগে, যেদিন তার কোনো দিনার বা দিরহাম থাকবে না। সেদিন তার কোনো সৎকর্ম না থাকলে তার জুলুমের পরিমাণ তার কাছ থেকে নেওয়া হবে আর তার কোনো সৎকর্ম না থাকলে তার প্রতিপক্ষের পাপ থেকে নিয়ে তা তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। (বুখারি, হাদিস : ২৪৪৯)।

গ্রে হ্যাট হ্যাকাররাও বিভিন্ন সিস্টেমের ত্রুটি খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু তারা কখনো কখনো সিস্টেমের মালিককে তার ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করে, কখনো আবার ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকারদের মতো বিপদেও ফেলে। ইসলামের দৃষ্টিতে এ ক্যাটাগরির হ্যাকিংও জায়েজ নেই। বিনা অনুমতিতে অন্যের গোপন তথ্য খোঁজাও ইসলামে নিষিদ্ধ।

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাকে বলেন, তোমার জন্য পর্দা (বাধা) তুলে নেওয়া হয়েছে। তাই তুমি আমার কাছে এসে আমার গোপন কথা শুনতে পারো, যতক্ষণ না আমি তোমাকে নিষেধ করি। (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১৩৯)

কাজেই হোয়াইট হ্যাট হ্যাকার অর্থাৎ যারা বিনা অনুমতিতে বিভিন্ন সিকিউরিটি সিস্টেমে, কম্পিউটার নেটওয়ার্কের ত্রুটি বের করে দেয়, তাদের এমন কাজ ইসলাম অনুমোদন করে না। তবে কেউ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে তাদের কম্পানি বা ব্যক্তির তথ্যের নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন ত্রুটি বের করার জন্য হ্যাকিং করে, তবে তা জায়েজ হবে। যারা এই প্রক্রিয়ায় বৈধ পদ্ধতিতে মানুষের নিরাপত্তার জন্য কাজ করে, তাদের ইথিক্যাল হ্যাকারও বলে।

বর্তমানে আমাদের স্মার্টফোনে ব্যবহৃত বিভিন্ন অ্যাপ আমাদের তথ্য হ্যাক করে। টেক্সট মেসেজ, কল লিস্ট, লোকেশনসহ যাবতীয় হ্যাক করে তারা আমাদের পছন্দ অপছন্দগুলো বিভিন্ন ডাটা অ্যানালিস্ট কম্পানির কাছে বিক্রি করে দেয়। যার মাধ্যমে তারা অনলাইনে আমাদের পছন্দ ও প্রয়োজন অনুযায়ী জিনিসের বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করে থাকে। বিনা অনুমতিতে মানুষের তথ্য এভাবে অন্য কম্পানির কাছে বিক্রি করে দেওয়াও হারাম।

কারণ মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণ তার অধিকার। তার অনুমতি ছাড়া এই হক থেকে অন্য কেউ উপকৃত হওয়ার অবকাশ নেই। হজরত সাহাল ইবনে সাআদ সায়াদি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.)-এর কাছে কিছু পানীয় দ্রব্য আনা হলো। তিনি তা থেকে কিছুটা পান করলেন। তাঁর ডান দিকে বসা ছিল একটি বালক, আর বাঁ দিকে ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠরা। তিনি (সা.) বালকটিকে বলেন, এ বয়োজ্যেষ্ঠদের দেওয়ার জন্য তুমি আমাকে অনুমতি দেবে কি? তখন বালকটি বলল, না, হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহর কসম! আমি আপনার কাছ থেকে প্রাপ্য আমার অংশে কাউকে অগ্রাধিকার দেব না। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) পানির পেয়ালাটা তার হাতে ঠেলে দিলেন। (বুখারি, হাদিস : ২৪৫১)।

অতএব যেসব অ্যাপভিত্তিক কম্পানি নিজেদের অ্যাপের মাধ্যমে মানুষের তথ্য চুরি ও বিক্রয়ে লিপ্ত রয়েছে, তারাও হারাম কাজ করছে।

কিছু হ্যাকার আছে যারা তথ্য চুরি না করলেও ডস অ্যাটাকের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাইটকে সাময়িক ডাউন করে দেয়। যার দরুন ওই প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এভাবে হ্যাক করাও ইসলামে নিষিদ্ধ। কিছু নিচু পর্যায়ের হ্যাকার এমনও আছে, যারা হ্যাকিংকে কাজে লাগিয়ে ধর্মীয় দাঙ্গা পর্যন্ত সৃষ্টি করে। কারণ রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, কেউ অপরের ক্ষতি করলে আল্লাহ তার ক্ষতি করবে। (আবু দাউদ, হাদিস : ৩৬৩৫)

আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই সূক্ষ্ম অপরাধগুলো থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করুন।

ফেসবুকঃ

Google-কে ছাড়িয়ে Facebook এখন শীর্ষ স্থান অধিকার করেছে। যে হারে এর ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে তাতে করে আগামী ২০১৪ সালেই এ সংখ্যা হবে দ্বিগুণ, অর্থাৎ ২০০ কোটি। বর্তমানে সবচেয়ে বেশী ফেসবুক ব্যবহারকারী রয়েছে এশিয়া মহাদেশে। আর দেশ হিসাবে ব্রাজিল হ'ল সবচেয়ে বেশী ফেসবুক।



ফেসবুকের ব্যবহারঃ

1. অধিকাংশ ফেসবুক ব্যবহারকারী নিজ নিজ ধর্মের প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধাশীল এবং প্রচার-প্রসারে সক্রিয়।
2. ফেসবুকের মাধ্যমে ইসলামকে সকলের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় সম্ভব। বিশেষ করে ইউরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার মত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে।
3. এর মাধ্যমে আক্বীদা-আখলাক সম্পর্কে সঠিক মতামত উপস্থাপন করা সম্ভব।
4. অনেকে ফেসবুকের মাধ্যমে ইসলামের সঠিক মূলনীতি ও শিক্ষা প্রচার-প্রসারের জন্য এবং দ্বীনকে তথা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ এবং বিভিন্ন ইসলামী প্রবন্ধ-নিবন্ধ পোষ্ট করে থাকেন।
5. এর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সামাজিক, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট ইত্যাদি বিষয়ে একে অপরের সাথে মতবিনিময় করা যায়।

6. প্রবাসী বা দূরে অবস্থানরত যে কোন ব্যক্তির সাথে অতীব স্বল্প খরচে কথোপকথন বা খোঁজ-খবর নেয়া সম্ভব।

উপকারিতা সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর এবং IUCN-এর Country Director নিয়াজ আহমেদ খান বলেন, ফেসবুকের মাধ্যমে আমি আমার অবসর জীবনে সকল বন্ধুদের সাথে সক্রিয় যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি এবং আমার সকল সুখ-দুঃখ, এমনকি আমার স্বপ্নের কথাও তাদের সাথে প্রতিদিন শেয়ার করতে পারি। আর সে কারণে ফেসবুক আমার নিকটে উপকারী একটি মাধ্যম।

ফেসবুকের অপকারিতা :

অল্প কিছু উপকারিতা থাকলেও এর ক্ষতির সংখ্যাই বেশি। ফেসবুক সবচেয়ে বেশি সময় নষ্ট করে। যা আল্লাহর দেয়া অনেক বড় নেয়ামত। আর ফেসবুক ব্যাবহারের মাধ্যমে আমরা সেই নেয়ামতের অপমূল্যায়ন করি। কোরআন হাদিসের আলোকে সময়ের মূল্য নিয়ে কিছু কথা নিম্নে দেয়া হলো–

সময়ের অপব্যায় নিয়ে যা বলে ইসলামঃ

সূরা ইনশিরাহর ৭-৮নং আয়াতে মহান রাব্বুল আলামীন বলেছেন, ‘তুমি দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করো আর যখনই সময় পাও প্রতিপালকের কাছে একান্তভাবে নিমগ্ন হও।’ সূরা-আরাফের ১৩১নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ‘যখন ভালো সময় আসত, তখন ওরা বলত ‘এটাই আমাদের প্রাপ্য।’ আর যখন খারাপ সময় আসত তখন মুসা ও তার সঙ্গীদেরকে ওরা এ দুর্ভাগ্যের কারণ মনে করত। কিন্তু ওদের দুর্ভাগ্য যে আল্লাহ (প্রণীত নিয়মে) নির্ধারিত ছিল, সে বিষয়ে ওদের কোনো বোধোদয়ই হয়নি।’

সময় ও জীবন আল্লাহর দান। সময়ের ইতিবাচক ব্যবহারই জীবনের সফলতা। সময়ের অপচয় ও অপব্যবহার জীবনের ব্যর্থতা। সময়ের যথাযথ ব্যবহার না করা বা অপব্যবহার করার জন্য জবাবদিহি করতে হবে আল্লাহর দরবারে। মহাগ্রন্থ কোরআন কারিমে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘সময়ের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।’ (সুরা ১০৩ আসর, আয়াত: ১-৩)।

একবার রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে প্রশ্ন করা হলো, সৌভাগ্যবান কারা? তিনি বললেন, সৌভাগ্যবান তারা, যারা দীর্ঘায়ু লাভ করেছে এবং তা নেক আমলের মাধ্যমে অতিবাহিত করেছে। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, দুর্ভাগা কারা? তিনি বললেন, দুর্ভাগা তারা যারা দীর্ঘায়ু পেয়েছে এবং তা বদ আমলে কাটিয়েছে বা আমলবিহীন অতিবাহিত করেছে। (তিরমিজি: ২৩২৯, মুসনাদে আহমাদ: ১৭৭৩৪)।

আমাদের প্রিয় মহানবী হযরত মুহম্মাদ (সা.) নিজে সময়কে গুরুত্ব দিতেন এবং তাঁর উম্মতদেরকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে তাকিদ দিয়েছেন। প্রতিটি মানুষকে সময়ের হিসাব কিয়ামতের দিন দিতে হবে বলে তিনি সর্তক করে দিয়েছেন। রাসূল (সা.) বলেছেন:

কিয়ামতের দিন কোন বান্দা চারটি প্রশ্নের উত্তর না দেয়া পর্যন্ত সামনে যেতে পারবে না। সেই চারটি প্রশ্ন হলো– সে তার জীবনকাল কোন কাজে ব্যয় করেছে, তার যৌবনকাল কোথায় ব্যয় করেছে, তার সম্পদ কোথা থেকে আয় করে কোথায় ব্যয় করেছে এবং তার অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী সে আমল করেছে কি না। এই চারটি বিষয়ই সময়ের সাথে সম্পর্কিত।

পরকালে মানুষকে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব দিতে হবে। হাদিস শরিফে রয়েছে, 'রোজ হাশরে শেষ বিচারের দিনে প্রতিটি মানুষ পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছাড়া এক কদমও নড়তে পারবে না। তার জীবনকাল কী লক্ষ্যে কাটিয়েছে? যৌবনকাল কী কাজে ব্যয় করেছে? কোন পথে আয় করেছে? কী কাজে ব্যয় করেছে? জ্ঞান অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করেছে কি না?' (তিরমিজি ৪:৬১২/২৪১৬, মিশকাত: ৫১৯৭)।)। কিন্তু মানুষ মোহের ঘোরে আচ্ছন্ন।

প্রিয় নবীজি (সা.) বলেন, 'তোমরা পাঁচটি জিনিসকে তার বিপরীত পাঁচটি জিনিসের পূর্বে মূল্যায়ন করো ও তার সদ্ব্যবহার করো। তোমার যৌবনকে বার্ধক্যের পূর্বে, সুস্থতাকে অসুস্থতার পূর্বে, সচ্ছলতাকে দারিদ্র্যের পূর্বে, অবসরকে ব্যস্ততার পূর্বে, জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে।' (বায়হাকি, শোআবুল ইমান: ১০২৪৮, মুসনাদে হাকিম: ৭৮৪৬)। পরকালে মানুষ যে বিষয়ে সবচেয়ে অনুতপ্ত হবে তা হলো, অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার না করা। সময়ে নেক আমল করলে বান্দার অবস্থার উন্নয়ন হবে, বদ আমল করলে তার অবনতি হবে। আমল ছাড়া সময় পার করলে, তাও তার জন্য প্রকারান্তরে ক্ষতি হিসেবেই গণ্য হবে। কারণ, মানুষের আয়ুষ্কাল প্রবহমান সময়। তা যদি সৎ কর্মে ব্যয়িত হয়, তবে নেক আমল হিসেবে গণ্য হবে; আর যদি নেক আমলবিহীন চলে যায়, তা বদ আমল হিসেবেই পরিগণিত হবে। যেহেতু নিষ্ক্রিয়তা বা অকর্মণ্যতাও একটি ক্রিয়া। উদাসীনতা বা সময়ের প্রতি অবহেলা সম্পর্কে সাবধান করে আল্লাহ তাআলা কোরআন আজিমে বলেন: 'প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদিগকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে, যতক্ষণ না তোমরা সমাধিসমূহ দেখতে পাও (তোমাদের মৃত্যু হয়)। এটি কখনো সংগত নয়! অচিরেই তোমরা জানতে পারবে। আবারও বলি, এটি মোটেই সমীচীন নয়; তা তোমরা অনতিবিলম্বে জানতে পারবে। না, তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা মোহগ্রস্ত হতে না। তোমরা (সময়ের প্রতি উদাসীন কর্মে অবহেলাকারীরা) অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে (তাতে প্রবেশ করবে)। পুনশ্চ! অবশ্যই অতি অবশ্যই তোমরা জাহান্নাম চাক্ষুষ দেখে (তাতে প্রবেশ করে তার শাস্তি ভোগ করে) প্রত্যয় লাভ করবে। অতঃপর অবশ্যই সেদিন তোমাদিগকে প্রদত্ত সব নিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।' (সুরা ১০২ তাকাছুর, আয়াত: ১–৮)।

আমরা প্রায় সময় নানান ব্যস্ততায় ব্যতিব্যস্ত থাকি। যেকোনো উপলক্ষে অবসর যখন আসে, তা আমাদের জন্য মহামূল্যবান নিয়ামত। সময় আমাদের জীবনের এমন একটি মূলধন বা পুঁজি, যা বিনিয়োগ করলে আমরা ইহকাল ও পরকালে লাভবান ও উপকৃত হব; আর এটি হেলায় নষ্ট করলে উভয় জগতে ক্ষতিগ্রস্ত হব। সময় চলে গেলে তা আর কখনো ফিরে আসে না।

অবসরে আমরা যে আমলগুলো করতে পারি তা হলো, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নিয়মিত

যথাসময়ে আদায় করা। পাঁচ ওয়াক্ত নফল নামাজ তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশত, জাওয়াল, আউওয়াবিন, সলাতুত-তাসবিহসহ অন্যান্য সুন্নত ও নফল নামাজ পড়া। অজু, গোসল ও নামাজের মাসআলা-মাসায়েল, সুরা-কিরাত ও দোয়া-কালাম ভালোভাবে জানা। বেশি বেশি কোরআন তিলাওয়াত করা। অর্থ, ব্যাখ্যাসহ কোরআন বুঝে পড়ার চেষ্টা করা। কোরআন তিলাওয়াত শেখা ও শুদ্ধ করার চেষ্টা করা। কোরআনের বিশেষ বিশেষ ফজিলতের আয়াতসমূহ ও সুরাসমূহ মুখস্থ করা, ব্যাখ্যাসহ অধ্যয়ন করা। নবীজির ভাষা, কোরআনের ভাষা ও জান্নাতের ভাষা আরবি ভাষা এই অবসরে শেখার চেষ্টা করা। প্রতিটি বাসাবাড়িতে নামাজ ও ইবাদতের জন্য বিশেষ স্থান নির্ধারণ করা।অবসরে পারিবারিক পরিমন্ডলে নিয়মিত দ্বীনি তালিমের আয়োজন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে পরিবারের সদস্যরা একদিকে একঘেয়েমি থেকে যেমন মুক্তি পাবেন, অন্যদিকে নানা রকম মন্দ আকর্ষণ, আসক্তি ও হতাশা থেকেও রক্ষা পাবেন। সময়ও ভালো কাটবে, শরীর ও মন ভালো থাকবে। সময় ও কর্ম ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। আল্লাহর রহমত লাভ হবে। দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াবি হাসিল হবে।

এছাড়াও আরো কিছু অপকারিতাঃ

1. ফেসবুকে একজন ব্যক্তির একাধিক ভূঁয়া পরিচয় (Fake id) রয়েছে। বিশেষ করে বিভিন্ন রাজনৈতিক ছাত্র নেতারা মেয়ে হিসাবে ভূঁয়া পরিচয় (Fake id) ব্যবহার করে থাকে।
2. নিয়মিত ফেসবুক ব্যবহারকারী একজন নেশাগ্রস্ত মানুষের মত আচরণ করে থাকে। যেমন- সে আচরণে উগ্রতা, চঞ্চলতা, কাজের প্রতি অমনোযোগী হয়ে পড়ে। এটা ব্যবহারের ফলে তৎক্ষণাৎ প্রশান্তি লাভ করে।
3. এর মাধ্যমে ছেলে-মেয়েরা পরস্পর পরিচিত হয়ে প্রেম-প্রণয়ে জড়িয়ে পড়ে। এমনকি বিবাহিতরাও পরকীয়া প্রণয়ের ফাঁদে পড়ে সুখের সংসারে অশান্তি ডেকে আনে এবং পরিশেষে বিবাহ বিচ্ছেদের মত কঠিন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।
4. এটা ব্যবহার করার ফলে সার্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হ'লেও অর্থনৈতিক ক্ষতি হয় এবং সময়ের বিরাট অংশ অপচয় হয়।
5. ফেসবুক ব্যবহারে অনেক অনাকাংখিত ঘটনা ঘটে থাকে। যেমন- ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যে জলন্ধর শহরে রাকষা নামের এক তরুণী ফেসবুকে তাকে নিয়ে দুই তরুণের অশালীন মন্তব্যের কারণে সিলিং ফ্যানের সাথে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। সে জলন্ধরে এমসিএম পলিটেকনিক কলেজের কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ প্রথম বর্ষের ছাত্রী ছিল।
6. এছাড়াও ফেসবুক ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শন পূর্বক সম্মানী ব্যক্তির সম্মানের হানি করা হয়।
7. রাজনৈতিক নেতারা তাদের রাজনৈতিক ও দলীয় কর্মকান্ড প্রচার-প্রসারের জন্য ফেসবুক ব্যবহার করে।
8. ফেসবুককে সমাজ বিজ্ঞানীরা প্রতারণার ফাঁদ ও অপরাধ কর্মকান্ডের মাধ্যম বলেছেন। যেমন- রামুতে ঘটে যাওয়া ধ্বংসলীলা, বাংলাদেশের সংগীত পরিচালকের প্রতারণা, টাঙ্গাইলে প্রেমের নামে যৌন সম্পর্ক এবং পরিশেষে তরুণীকে হত্যা ও গুম করা ইত্যাদি।

9. এই সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে তরুণ-যুবসমাজ শিক্ষার চেয়ে ধ্বংসের দিকেই বেশী এগিয়ে যাচ্ছে।

পরিশেষে ফেসবুক যদিও একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। তথাপি নিউটনের তৃতীয় সূত্রটির মত বলতে হয় 'প্রত্যেকটি ক্রিয়ার বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে'। অতএব একে পেশা বা নেশা হিসাবে গ্রহণ করা অনুচিত। শুধুমাত্র মতবিনিময়, যোগাযোগ রক্ষা, তথ্য আদান-প্রদান, ইসলাম প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রভূমি হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। আল্লাহ্ আমাদের মনের সকল উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত। তিনি আমাদেরকে সঠিক পথে চলার তাওফীক দিন- আমীন!

ইসলামিক দৃষ্টিকোন থেকে ফেসবুকঃ

ইন্টারনেট ব্যবহারকারী প্রায় প্রতিটি মানুষই এখন কম-বেশি ফেসবুক ব্যবহার করেন। ফেসবুক এখন পৃথিবীর অন্যতম আলোচিত বিষয়। ফেসবুক এ জগতের এক নতুন শক্তির নাম। এর মাধ্যমে কোনো দেশে বিপ্লব সাধিত হচ্ছে। কোথাওবা সরকারের গদি টালমাটাল হচ্ছে। আবার এর মাধ্যমে দুষ্কৃতিকারীরা মিথ্যা ছড়িয়ে দিচ্ছে। অশ্লীলতা ও নগ্নতাকে সহনীয় করে তুলছে। তরুণ প্রজন্মের অনেকের কাছেই আজ এই ফেসবুক এক আফিমের মতো। পৃথিবী জুড়ে অসংখ্য তরুণ-তরুণী এর মাধ্যমে অবৈধ সম্পর্ক গড়ছে এবং মিথ্যার রাজত্ব কায়েম করছে।

তেমনি এর মাধ্যমে হাজারো মুসলিম ভাই-বোন নিজেদের কল্যাণকর চিন্তা ও জনহীতকর ধারণা অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। বিশুদ্ধ আকীদা ও চিন্তা-চেতনার প্রসারও সহজ হয়ে গেছে। যখন যে উপলক্ষ আসছে সে সম্পর্কে ইসলামের দিক-নির্দেশনা সহজেই ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে এর মাধ্যমে। ইসলাম ও মানবতার শত্রুরা এতদিন যখন ইন্টারনেটের এই ভার্চুয়াল দুনিয়ায় ইচ্ছে মত ইসলাম ও ইসলামের নবী এবং তাঁর আদর্শকে অসম্মান বা অপমান কিংবা তার বিরুদ্ধে বিবেকহীন অপপ্রচার চালিয়েছে কোনো বাধা ছাড়া। আজ তারা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। তাদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেয়া যাচ্ছে। পৃথিবীর বিবেকবান মানুষের সামনে প্রকৃত সত্য তুলে ধরা যাচ্ছে এই ফেসবুকের মাধ্যমে।

বর্তমানে তাই নেককার মুত্তাকি লোকদেরও দেখা যাচ্ছে ফেসবুকে। কিন্তু জুকারবার্গের এ দুনিয়ায় পা রেখেই তাঁরা বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন অনেক দুরাচারী বা রুচিহীন লোকের উৎপাতের কারণে। অনেকে অযথা অভব্য বাক্য লিখে কিংবা অশালীন ছবি পোস্ট করে নিজের ওয়ালে। আর তা তাদের কাছে ভালো লাগলেও অনেকের কাছেই যে ন্যাক্কারজনক প্রতীয়মান হয় সেদিকে তারা খেয়াল করে না। এদের দেখে দমে গেলে হবে না। চেষ্টা করে যেতে হবে সাধ্যমত ভালো কথা বলে যেতে। সে লক্ষ্যেই বক্ষমান নিবন্ধে আমরা চেষ্টা করব ফেসবুক ব্যবহারের ১০টি ইসলামী নির্দেশিকা তুলে ধরতে। এগুলো মূলত ইসলামের আদর্শ বোধ থেকেই আমাদের সবার খেয়াল করা দরকার। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে বুঝার এবং মানার তাওফীক দান করুন।

(1) এটা জানা কথা যে পরিমিত লজ্জা নারী চরিত্রকে উচ্চতায় নিয়ে যায়। লজ্জা নারীর বিশেষ ভূষণ বৈ কি। আর লজ্জা খোয়ানোকে তার জন্য একটি দুর্যোগ ভাবা হয়। এটি কলংকিত করাকে এক ধরনের বেইজ্জতি গণ্য করা হয়। অতএব আপনি যখন ফেসবুকে শিষ্টাচারের বৃত্ত অতিক্রম করে কোনো

মেয়েকে খোশালাপে মেতে উঠতে দেখবেন। তার আলাপ এতোটা রুচিহীন হয় যে তা যেন কোনো পর্নোগ্রাফির দৃশ্য আপনার সামনে দেখতে দাঁড় করিয়ে দেয় অথবা আপনি শিষ্টাচার বা সার্বজনীন রুচি বহির্ভূত দৃশ্যাবলি দেখতে শুরু করেন। কিংবা চোয়াল উন্মুক্ত করে সে বলছে, 'হে আমার জীবন, আমার প্রাণপ্রিয়, হে আমার হৃদয়'... ইত্যাদি তবে প্রিয় পাঠক, আপনি তখনই নিশ্চিত হয়ে যাবেন যে মেয়েটি 'নির্লজ্জ। লজ্জা বলতে তার কিছু নেই!'

(2) এটা সর্বসম্মত বিষয় যে প্রথম যা ব্যক্তির চিন্তা, তার সংস্কৃতি এবং তার আচার-ব্যবহারের পরিচয় প্রদান করে তা হলো তার অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়গুলো। অতএব যখন আপনি ফেসবুকে কারও তথ্য শেয়ারের মধ্য দিয়ে অনুধাবন করবেন যে সে প্রেম ও মেকি ভালোবাসার বিদ্যালয় থেকে পাশ করে এসেছে বা এখনও সেখানে অধ্যয়নরত, তবে আপনি তার থেকে নিজের হাত ধুয়ে নিন। অন্য ভাষায়, তাঁকে একপাশে সরিয়ে দিন এবং তার কাছ থেকে সসম্মানে সরে আসুন।

(3) বিশ্বস্ততা ও সত্যনিষ্ঠতা হলো অন্যদের সঙ্গে আপনার সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার চাবিকাঠি। এটা গ্যারান্টি দেয়া যায় যে এই সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত বন্ধুরা আপনাকে একদিন আঘাত দেবে না। কিন্তু মিথ্যাবাদী, বিশ্বাস ও আস্থাহীন লোক আপনার জন্য খামোখাই অকল্যাণ ডেকে আনবে। আপনি যদি ফেসবুকে এমন কাউকে দেখেন যে কিনা নাম প্রকাশ না করে কিংবা আকার-ইঙ্গিতে অন্যের কথা বলে বেড়ায় এবং এমনকি এর চেয়ে খারাপ ও ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো যে সে নিয়মিত মিথ্যা বলে। যেমন মানুষের প্রশংসা কুড়াবার জন্য অন্যের লেখা বা বক্তব্য চুরি করে অথবা নিজের ক্ষুদ্র পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারে সে মরিয়া, তবে আপনাকে নিশ্চিত হয়ে যেতে হবে যে তাকে আপনি ডিলিট করবেনই। তার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ছিন্ন করতেই হবে। কারণ, তাঁর উপস্থিতি আপনার ক্ষতিই বয়ে আনবে।

(4) যে কারও ফেসবুক আপডেটগুলো আপনাকে উপকৃত করছে, হয়তো সে আপনার চেতনাকে শাণিত করছে কিংবা আপনার তথ্য বা জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করছে অথবা আপনাকে নতুন নতুন অভিজ্ঞতায় আলোকিত করছে- তিনি ওই ব্যক্তি থেকে উত্তম যে তার নিত্য-নতুন আপডেটে শুধু প্রেম-ভালোবাসা কিংবা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কথাই শেয়ার করে। তখন আপনি আগের বন্ধুদের নিয়েই সন্তুষ্ট থাকুন। এমনকি যদি এর খেসারত হিসেবে অনেকেই আপনাকে শেয়ার না করে। আর আপনি দ্বিতীয় জন থেকে দূরে থাকুন। কারণ তাকে স্মরণ করে আপনার কোনো লাভ নেই।

(5) আমার প্রিয় বোন, মেয়েদের ফেসবুকে শুধু যদি মেয়েরা অংশগ্রহণ করে তবে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে, কিন্তু যদি কোন ছেলের সাথে অত্যন্ত প্রয়োজনে অংশগ্রহণ করতেই হয়, তবে সেখানে যেন থাকে আপনার আত্মসম্মানবোধ। ছবি শেয়ার করা কখনো আপনার জন্য বৈধ হবে না। তার সাথেই শুধু অতীব প্রয়োজনীয় কোন আলাপ করতে পারেন যে আপনাকে সম্মান করে, আলাপ করতে চাইলে শালিন ও মার্জিত শব্দ চয়ন করে। ভদ্রোচিত পন্থায় আপনার সাথে প্রয়োজনীয় তথ্য আদান-প্রদান করবে। অতএব সে আপনাকে সম্বোধন করায়, আপনার প্রশংসায় কিংবা অভিজ্ঞতায় মুগ্ধ হবার ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন করবে না। কিন্তু আপনি যাকে বা যাদের দেখবেন ফেসবুকে রুচিহীনভাবে সম্বোধন করছে কিংবা শ্রদ্ধার সীমা থেকে দূরে গিয়ে সম্বোধন করছে, যেমন : হে চাঁদ, আমার মধু, আমার ভালোবাসা ইত্যাদি বলছে, তখন আপনি বুঝে নেবেন যে সে বা তারা প্রেম-ভালোবাসার প্রতারক ভিখিরি। সে আপনাকে অসম্মান করবে, আপনার মর্যাদায় আঘাত দেবে। অতএব আপনি আর তাদেরকে আপনার সামনে থাকতে দেবেন না। এমনকি দ্বিতীয়বারের মতোও না।

(6) প্রত্যেকের নিজস্ব লক্ষ্য ও মনোযোগ রয়েছে। আপনার মনোযোগ ও রুচিকে সবসময় উন্নততর করুন। ফেসবুকে রুচিবোধ সম্পন্ন এবং সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গির লোকদের ছেঁকে বের করুন। এমন ব্যক্তির সঙ্গ আপনাকে কোনো উপকারই দিতে পারবে না যে এই সাইটে শুধুমাত্র গেমস বা খেল-তামাশা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। অথবা যে কি না গানের সিলেবল বা অংশ স্থাপন বা অধঃপতিত ছায়াছবির দৃশ্য উত্থাপন কিংবা অন্যদের নিয়ে ঠাট্টা-মশকতা বা জরুরি বিষয়ে খেল-তামাশা করা ছাড়া কিছুই জানে না। আপনার তালিকাটিকে পরিষ্কার করুন। তা শুধুমাত্র সুন্দর, দরকারী ও ফলপ্রদ বিষয় ছাড়া কিছুই বহন করবে না। সন্দেহ নেই এটি আপনার জন্য কল্যাণ নিয়েই ফিরে আসবে। কারণ, সুন্দর সুস্থ পরিবেশ আপনাকে সুখাদ্য সরবরাহ করবে আর অসুস্থ পরিবেশ আপনাকে কুখাদ্য দেবে। এখন সিদ্ধান্ত আপনাকেই নিতে হবে।

(7) কোনো বিষয়ে লাইক দিলে তা আপনার দিকে পথ দেখাবে। লাইক পাওয়া ব্যক্তিকে আপনার প্রতি আগ্রহী করবে। যদিও আপনি এমন ব্যক্তি হন যে পড়ে না, দেখে না, কিছু বোঝে না। যে শুধু নিজের ভালোলাগার ঈষৎ প্রকাশ ঘটায় এবং খানিক বাদেই চলে যায়। অতএব আপনি কী বলছেন, কী পড়ছেন এবং কোনটাতে লাইক দিচ্ছেন তা জেনে বুঝেই দিন। ফেসবুকে কতই না পেইজ ওপেন করা হয়েছে খারাপ ও কুৎসিত, যা ধর্ম ও চরিত্র বিরোধী। আর কত জনকেই দেখা যায় নির্বুদ্ধিতাবশত এসব পেইজকে লাইক দেন। অথচ তারা খেয়াল করেন না যে এই লাইক দেয়াটা ওই পাতা উন্মোচনকারীকে এসব গাল-মন্দ ও ন্যাক্কারজনক কথাবার্তায় আরও উৎসাহিত করবে। তার লাইক দেয়ার মাধ্যমে বিষয়টি আরও প্রচার পাবে। আপনি ভালো করেই জানেন যে, অন্যায় করা যেমন অপরাধ অন্যায় পছন্দকারী হয়ে তার প্রসার করাও তেমনি অপরাধ। অথচ তারা বুদ্ধিমানের পরিচয় দিতে পারেন এ ব্যাপারে নিরবতা ও নিস্পৃহতা প্রদর্শন করে। এমন করা হলে চটুল প্রচারকামী ওই ব্যক্তি নিরুৎসাহিত হবে, তার উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে, অধিক পাঠক টানা কিংবা অন্যকে ক্ষুব্ধ করার অশুভ অভিপ্রায়ে ধাক্কা লাগবে।

(8) অন্যদের সঙ্গে গিভ এন্ড টেক বা 'দাও এবং নাও' নীতি পরিহার করুন। কারণ আপনি যদি এই নীতির ওপর চলেন তাহলে অচিরেই আপনি এমন স্বার্থপর ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি পাবেন যে কি-না সবকিছুতেই বিনিময় প্রত্যাশা করে- এমনকি অনুগ্রহেরও। ফেসবুকে আপনি ওই বিষয়গুলো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করতে ভুলবেন না যা নতুন কোনো একাউন্ট খোলা ছাড়াই অন্যদের সঙ্গে শেয়ার করা সম্ভব। এবং যাতে আপনার বা তাদের ওয়াল থেকে এ ব্যাপারে তাদের প্রতিক্রিয়াও দেখা যায়। বিনিময় বা বদলার জন্য অপেক্ষায় না থেকে সৌজন্যবোধের পরিচয় দিন। শেয়ারযোগ্য মনে করলে সেটি পোস্টকারীর সঙ্গে পরিচয় বা দীর্ঘ সম্পর্ক আছে কি-না তার প্রতি খেয়াল না করে অবশ্যই শেয়ার করুন। আর স্মরণ করুন যে আপনিও তো তাদের কারও পাতায় কোনো প্রকার জবাব দেন নি। অথচ তারপরও তারা বিষয়টি আপনার জন্য সংরক্ষণ করে গেছেন। বরং আপনি তাদেরটা পড়বেন আর তারাও আপনারটা পড়বে। আর এটিই সবচে গুরুত্বপূর্ণ!

(9) আপনার ফেসবুক ওয়ালে শুধু তা-ই রাখবেন যা সুন্দর এবং কল্যাণকর। আর আপনি নিষিদ্ধ বিষয় থেকে হুঁশিয়ার থাকবেন। কারণ তা এক প্রকার গুনাহে জারিয়াহ বা চলমান পাপ কিংবা কোনো বিষণ্ন বিষয়কে মনে করিয়ে দেবে। কারণ, এমন হতে পারে যে কোনো মেয়ের জন্য গানের কোনো অংশ রেখে দিলেন আর সে মারা গেল –আল্লাহ তার ওপর রহম করুন- তখন তা তার কোনো বন্ধু গ্রহণ করল যা সে অন্যদের মাঝে প্রচার করল। আর আপনি যদি মারা যান? তবে তা তো আরও উদ্বেগের বিষয়। সবসময় আপনি যদি মন্দ বর্জন না করতে পারেন তবে অন্তত চেষ্টা করুন। তা শুধু নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখুন। তা অন্যের কাছে প্রচার করে নিজের গুনাহের পাল্লা ভারি করার কোনো প্রয়োজন নেই।

(10) আপনি ফলবতী গাছ হোন, যার ছায়া অন্যদেরকে অজ্ঞতার তাপ থেকে রক্ষা করে। যার ফল অবসরের ক্ষুধা মেটায়। আপনার বন্ধুরা তথ্য দেবার পর তাদের জন্য উপকারী বিষয় উপস্থাপন করুন। তাদের কষ্ট বেদনায় আপনার সম্প্রদায়কে শরীক করুন, তাদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় এবং তাদের দেশের চিন্তা-পেরেশানী আপনার ভাইদের জানান। আপনি সবার কাছে থাকুন। একে অন্যের সাথে আপনার লেনদেনে ভারসাম্য রক্ষা করুন। তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবেন না। তাদের সমালোচনা করবেন না। কিংবা তাদের ব্যক্তিগত বিষয়ে নাক গলাবেন না।

পাঠক, পরিশেষে জেনে রাখুন, আপনি নিজের জীবনের পাতাগুলো দিয়ে অমর হতে পারেন। সম্মানের সঙ্গে আপনি আলোচিত হতে পারেন। এমনকি মৃত্যুর পরও। অতএব আপনার ফেসবুকের পাতাটিকে বানান ইসলামের ও শান্তির এবং সৌন্দর্য ও ভালোবাসার। এমন পাতা যা আপনার নাম ও কীর্তিতে সদা সর্বদা আলোচিত ও স্পন্দিত হতে থাববে। সর্বোপরি মনে রাখবেন আপনার প্রতিটি কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। আর আমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে প্রতিটি সময়ের হিসেব দিতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সবাইকে প্রযুক্তির ভালো দিকগুলো গ্রহণ করার এবং মন্দ দিকগুলো বর্জন করার তাওফীক দিন। সকল মন্দ থেকে বাঁচার এবং কল্যাণে শরীক তাওফীক দান করুন। প্রতিটি সময়কে আখিরাতের সঞ্চয় বাড়ানোর কাজে ব্যয় করবার সৌভাগ্য দান করুন।

গিফ্টের প্রলোভনঃ

বিভিন্ন উৎসব কে কেন্দ্র করে প্রলোভন দিয়ে প্রতারণা করার সুযোগের সম্পূর্ণ ব্যবহার করছে একদল প্রতারক। দেশের কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম ব্যবহারকারীদের সম্ভাব্য স্ক্যাম সম্পর্কে সতর্ক করেছে। জানা গিয়েছে যে কয়েকটি চিনা ওয়েবসাইট (Chinese Websites) বিনামূল্যে উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ব্যবহারকারীদের ফিশিং লিঙ্ক (Phishing Links) পাঠাচ্ছে। লিঙ্কগুলি খুললেই



ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য যেমন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ, ফোন নম্বর এবং আরও অনেক কিছু তথ্য পাচার হয়ে যাচ্ছে।

সাইবার ক্রাইম অধিদপ্তর একটি পরামর্শও জারি করেছে। তারা বলেছে, 'বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে (হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম, টেলিগ্রাম ইত্যাদি) ভুয়ো মেসেজ ছড়িয়ে পড়ছে। ব্যবহারকারীদের বিনামূল্যে পুরস্কারের লোভ দেখানো হচ্ছে। বেশিরভাগই ফিশিং লিঙ্ক মহিলাদের পাঠানো হচ্ছে। এই ফিশিং ওয়েবসাইটগুলির লিঙ্ক বেশিরভাগই চিন থেকে পাঠানো হচ্ছে। কারণ এই ওয়েবসাইটগুলি চিনা .cn ডোমেন এক্সটেনশন ব্যবহার করছে। অন্যরা .xyz এবং .top এর মতো এক্সটেনশনগুলি ব্যবহার করছে। ব্যবহারকারীরা প্রথমে একটি লিঙ্ক পান। ব্যবহারকারী যখন লিঙ্কটিতে ক্লিক করেন, তখন তাঁকে ভুয়ো অভিনন্দন বার্তা দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। এরপর ব্যবহারকারীকে তাঁর ব্যক্তিগত বিবরণ পূরণ করতে বলা হয়। একবার সমস্ত বিবরণ পূরণ করা হলে ব্যবহারকারীকে পুরস্কার দাবি করার জন্য বন্ধু এবং আত্মীয়দের মধ্যে মেসেজ শেয়ার করতে বলা হয়। একটি বিনামূল্যে উপহার পাওয়ার প্রলোভনে পড়ে ব্যবহারকারী সাইবার আক্রমণকারীদের কাছে তাঁর সমস্ত ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ করে ফেলেন।

অনলাইন স্ক্যাম এড়ানোর উপায়:

এই ধরনের স্ক্যামগুলির ফাঁদে না পড়তে চাইলে আপনাকে এমন লিঙ্কগুলি থেকে সতর্ক থাকতে হবে। সর্বদা এর উৎস খতিয়ে দেখা উচিত। এছাড়াও ডোমেন নামটি সর্বদা চেক করা উচিত এবং যদি আপনি মনে করেন যে লিঙ্কটি একটি অবৈধ উৎস থেকে এসেছে, তাহলে আপনার এটিতে ক্লিক করা ঠিক হবে না। ভুলবশত লিঙ্কটিতে ক্লিক করে ফেললেও ব্যক্তিগত ডেটা প্রকাশ করা উচিত।

রেডিও : পরিবারের বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে বহু বছর থেকে রেডিও ও টেলিভিশন স্থান দখল করে রেখেছে। মাঝে রেডিওর অবস্থান নড়বড়ে হয়ে গেলেও এফ.এম রেডিও-এর মাধ্যমে এটির গতি ত্বরান্বিত হয়েছে। বর্তমানে এই মাধ্যমে ইসলামিক কোন কিছুই প্রচার হয় না। এটা অনৈসলামী কার্যকলাপের অন্যতম হাতিয়ার। কোন প্রকার তার বা সেট ছাড়া মোবাইলে চালু করা যায় বলে সমাজে এর প্রভাব অনেক বেশী। এগুলোর মাধ্যমে আমাদের ভাষারও বিকৃতি হচ্ছে বলে জানা যাচ্ছে।

টেলিভিশন : বাড়ীর চারদেয়ালের মধ্যে বিনোদনের মাধ্যম টেলিভিশন আজকাল 'শয়তানের বাক্সে' পরিণত হয়েছে। আমাদের দেশের মহিলারা এখন জাতীয় ও বিজাতীয় সিরিয়ালে আসক্ত। ফলে অপসংস্কৃতির সয়লাব সর্বত্র পরিদৃষ্ট হচ্ছে। এসব সিরিয়ালের ফলে নারীরা বিজাতীয় পোষাক-পরিচ্ছদ, পূজা-পার্বণ, ভাষা প্রভৃতিতে আকৃষ্ট হচ্ছে। পরিবারের নারী সদস্যদের দেখে দেখে শিশুরাও এতে আকর্ষিত হচ্ছে। এই মাধ্যমে ভালো কোন ইসলামিক চ্যানেল না থাকায় এগুলোর প্রভাব আরো বেশী ত্বরান্বিত হচ্ছে। অধুনা খ্যাতিমান দাঈ ডা. যাকির নায়েক পিসটিভি চালু করার মাধ্যমে এটার বিপক্ষে একটি সুস্থ-ধারা প্রচলনের চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিছুদিন চলার পর অনৈসলামী শক্তির প্রভাবে সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে। এই চ্যানেল ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করছিল।

প্রিন্ট মিডিয়া : পত্রিকা, ম্যাগাজিন, ক্রোড়পত্র প্রভৃতিতেও ইসলামী কোন কিছু তেমন প্রচার হয় না বললেই চলে। প্রতি সপ্তাহে ছোট কলামে ভিতরের লেখা পাঠকের চোখ এড়িয়ে যায়। এছাড়া পত্রিকা খুললেই অর্ধনগ্ন নারী-পুরুষের ছবিতে এতটাই পূর্ণ থাকে যে, এখন সংবাদপত্র পড়ার জো নেই। বাজার-ঘাট, রাস্তার আশেপাশে বিলবোর্ডও সাইনবোর্ডেও অনৈসলামিক বিষয়গুলোর প্রাধান্য চোখে পড়ে।

ছবি এডেটিং এর মাধ্যমে প্রতারনাঃ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আমাদের অনেক ভাইবোন প্রতিনিয়ত নানা ছবি আপলোড করে থাকে। কখনো নিজের কখনো বা বাচ্চার। আর এই সুযোগ বুঝে একদল প্রতারক চক্র ছবি গুলো এডিটিং করে নেয় কোন আপত্তিকর ভিডিও বা ছবির সাথে। তারপর চলতে থাকে ব্লেকমেইলিং। মুক্তিপন দিতে হবে নয়তো ভাইরাল হবে এসব ছবি। কতো সংসার ভেঙেছে এই কারনে তার ইয়াত্তা নেই। সাথে কতো বোন আত্মহত্যার মতো কবিরা গুনাহ করেছে।আল্লাহ হেদায়েত দান করুন। চলুন দেখে নেই ছবি তুলা নিয়ে কি বলে ইসলাম।



ছবি তোলার বিধান:

ছবি অস্তিত্বলাভের মাধ্যম– ছবির আভিধানিক পরিচয় থেকে ছবি সৃষ্টি বা অস্তিত্বলাভের দু’টি মাধ্যমের কথা জানা যাচ্ছে।

1. একটি হলো হাতে অঙ্কিত ছবি। যাকে হস্তচিত্রশিল্প বলা যেতে পারে।

2.অন্যটি হলো – যান্ত্রিক মাধ্যম অবলম্বনে গৃহীত ছবি। যাকে আলোকচিত্রশিল্প বা ফটোগ্রাফি বলা হয়।

ফটোগ্রাফির পন্থাঃ ফটোগ্রাফি বা আলোকচিত্রশিল্পের মাধ্যমে ছবি সৃষ্টির পন্থা বিশ্লেষণ করে

আলোকচিত্রশিল্প (ইংরেজি: Photography) হচ্ছে আলো বা অন্য কোনো রকম তড়িতচুম্বকীয় বিচ্ছুরণকে (electromagnetic radiation) কাজে লাগিয়ে টেঁকসই ছবি সৃষ্টি করার শিল্প বিজ্ঞান ও পদ্ধতি।

আলোকচিত্রগ্রাহী ফিল্ম জাতীয় আলোক সংবেদনশীল বস্তুর মাধ্যমে রাসায়নিক পদ্ধতিতে বা কোনো ইমেজ সেন্সরের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক পদ্ধিতিতে ফটোগ্রাফ তোলা সম্ভব।

এই পন্থাটি কোনো একটি জিনিসের হুবহু ছবিকে আলোকশিল্পের মাধ্যমে সংরক্ষণের কথা বিশ্লেষণ করছে।

তবে আধুনিক ফটোগ্রাফিতে অন্যান্য আরো পন্থা আছে যেখানে আলোকশিল্প ছাড়াই ডিজিটাল পেন বা পেন টোল ব্যবহার করে যে কোনো জিনিসের ছবি অঙ্কন করা যায়।

যেমন বর্তমান সময়ে ফটোশপের কাজে ব্যাপক জনপ্রিয় একটি সফটওয়্যার অ্যাডোবি ফটোশপ সম্পর্কে বলা হয় –

'প্রাথমিকভাবে ফটোশপ তৈরি হয়েছিল কেবলমাত্র ছাপার কাজে ব্যবহার করা হবে এমন ছবি সম্পাদনা করার জন্য।

কিন্তু ইন্টারনেট বিস্তারের সাথে সাথে ফটোশপ ব্যাপকভাবে ইন্টারনেটের ছবি সম্পাদনা করার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ফটোশপের একটি সহকারী সফটওয়্যার অ্যাডোবি ইমেজরেডি দেওয়া হয়েছে যাতে ইন্টারনেট সম্পর্কিত আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা আছে।

ফটোশপের ছবি আঁকার তুলিগুলি এতো উচ্চমানের যে বহু শিল্পী ডিজিটাল পেনের সাহায্যে ফটোশপে ছবি আঁকেন।

ছবি প্রদর্শনের মাধ্যম:

হাতে অঙ্কিত ছবি সাধারণত কাগজে দেয়ালে ব্যাগে ইত্যাদি অফ লাইন ভিত্তিক ব্যবস্থায় প্রকাশ লাভ ও দৃশ্যায়ণ হয়।

আর ফটোগ্রাফির মাধ্যমে সৃষ্ট ছবি ছাপা বা প্রিন্ট করার দ্বারা অফ লাইন ভিত্তিক ব্যবস্থায় প্রকাশ ও দৃশ্যমান হওয়ার সাথে সাথে মাল্টিমিডিয়া ও অন লাইন ভিত্তিক ব্যবস্থায়ও দৃশ্যমান হয়।

ছবির নানান প্রকার

যে বস্তু বা বিষয়ের ছবি গৃহীত হয় তার বিবেচনায় ছবিকে প্রাথমিকভাবে দুই প্রকারে ভাগ করা যেতে পারে। বস্তু জগতের ছবি ও জীব জগতরে ছবি।

আবার দৃশমান ও প্রদর্শনের বিবেচনায় ছবিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।
1.কাগজ দেয়াল কাপড় ব্যাগ ইত্যাদি অফ লাইন কেন্দ্রীক ব্যবস্থায় প্রদর্শিত ছবি

2.মাল্টিমিডিয়া ও অন লাইন কেন্দ্রীক ব্যবস্থায় প্রদর্শিত ছবি।

এতাটুকু আলোচনা যদি আপনি ভালোভাবে বুঝে পড়েন তবে আমাদের পরবর্তী কথাগুলো সহজে বুঝতে পারবেন। কেননা ছবি সৃষ্টির মাধ্যম বা প্রকাশের মাধ্যম ভেদে হুকুমও ভিন্ন ভিন্ন হব।

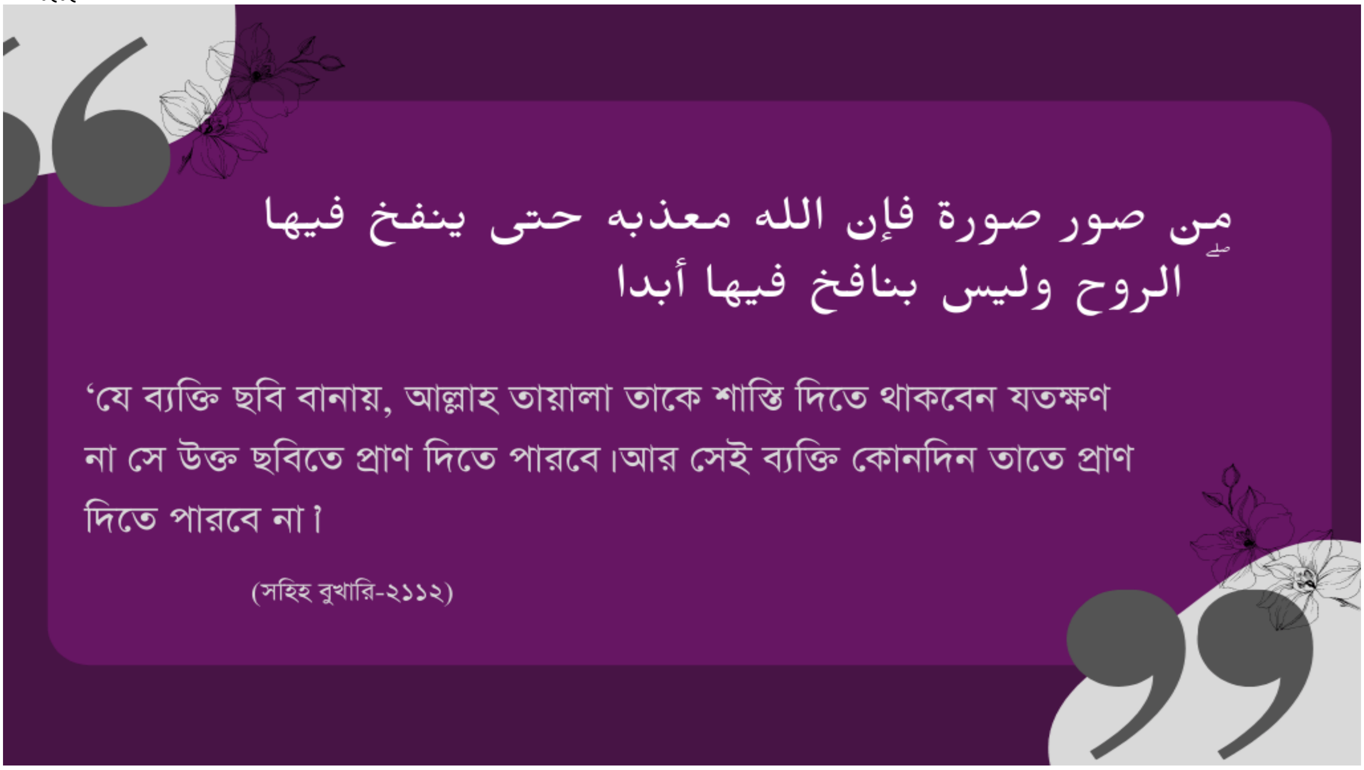
মূর্তি ও ভাস্কর্য তৈরির বিধান:

পাথর মাটি কাঠ ইত্যাদি দ্বারা যদি মানুষ বা যে কোনো প্রাণীর অবয়ব সৃষ্টি করা হয়। যার নিজস্ব ছায়া থাকে। মাথা থাকে। পরিপূর্ণ থাকে সকল অঙ্গ।

সেটা খেলনার পুতুল নয় বা তার চেয়েও তুচ্ছ কোনো বস্তুও নয়। বরং সব দিক বিবেচনায় সেটা একটি মূর্তি-ভাস্কর্য বা তারই অনুরূপ হয়। তাহলে তা ফুকাহায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে হারাম।

মূর্তি ও ভাস্কর্য হারাম হওয়ার দলিল:

রাসুলুল্লাহ – সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম – বলেন –



ছবি তোলার বিধান

অপর হাদিসে বলেন –

أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله

অনুবাদ – কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে থেকে তারা বেশি শাস্তি পাবে যারা আল্লাহর সৃজন শিল্প নিয়ে প্রতিযোগিতা করতো। (সহিহ বুখারি – ৫৬১০)

অন্য হাদিসে বলেন –

كل مصور فى النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه فى جهنم

‘প্রত্যেক চিত্রশিল্পি জাহান্নামে যাবে। প্রত্যেক চিত্রের বিপরীতে জীবন্ত একেকটি সত্তা বানানো হবে। অতপর সে তাকে জাহান্নামে শাস্তি দিবে।’ (সহিহ মুসলিম – ৫৬৬২)

জড় বস্তুর ছবি তোলার বিধান কী?

বই খাতা গাড়ি বাড়ি পাহাড় সাগর থেকে নিয়ে চাঁদ সূর্য গ্রহ নক্ষত্রসহ মহাবিশ্বের প্রাণহীন ছোট বড় সকল বস্তুর ছবি তোলা ও সর্বপ্রকার মাধ্যমে প্রকাশ করা সবকিছুই জায়েয।

সেটা হাতে অঙ্কন করা হোক বা ফটোগ্রাফির মাধ্যমে গ্রহণ করা হোক বা অন্য যে কোনো উপায়ে তৈরী করা হোক।

প্রিন্ট করে কাগজে বা কাপড়ে বা দেয়াল ইত্যাদিতে স্থাপন করা হোক বা মাল্টিমিডিয়া পর্দা যেমন মোবাইল কম্পিউটার টেলিভিশন ইত্যাদিতে প্রদর্শিত হোক।

বা ওয়েব পেইজ যেমন ফেসবুক টুইটার ইনস্টাগ্রাম রেডিট ইত্যাদি যে কোনে কিছুতে প্রদর্শিত হোক।

গাছের ছবি আঁকা কি জায়েজ?

জীব বিজ্ঞানে গাছপালা ফুল-লতা ইত্যাদিকে জীব জগতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাই কোনো কোনো ফিকাহবিদ গাছপালাকে প্রাণীকুলের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন।

এ জন্যই জড় জগতের ছবি জায়েয হওয়ার ব্যাপারে সকল ফুকাহায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করলেও গাছপালার ছবি জায়েয হওয়ার ব্যাপারটি নিয়ে দু-একজন ফকিহ মতবিরোধ করেছেন।

তবে বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ কথা হলো গাছপালার ছবিও জায়েয ছবির অন্তর্ভুক্ত।

যেমন ড. ইউসুফ আল কারদাভি - হাফিজাহুল্লাহ - বলেন -

أما ما عدا ذلك من الصور واللوحات، فإن كانت لغير ذي روح، كصور النبات والشجر، والبحار والسفن والجبال، والشمس والقمروالكواكب، ونحوها من المناظر الطبيعية لنبات أو جماد فلا جناح على من صورها أو اقتناها

অনুবাদঃ এ সব (দেহ বিশিষ্ট অবয়ব) ব্যতীত উদ্ভিদ-গাছ নদী সাগর জাহাজ পাহাড় সূর্য চাঁদ নক্ষত্র ইত্যাতি নৈসর্গিক দৃশ্যাবলি চাই তা উদ্ভিদ হোক বা জড় বস্তু হোক, তার ছবি অঙ্কন বা সংরক্ষণে অসুবিধা নেই। (আল হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম -১২৯)

গাছের ছবি আঁকা কি জায়েজ প্রমাণকারী হাদিস

10. সাঈদ ইবনে আবিল হাসান - রাহিমাহুল্লাহ - বলেন -

كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير .

فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول سمعته يقول (من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا) فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح

অনুবাদঃ 'আমি ইবনে আব্বাস - রাদিয়াল্লাহু আনহু -'র কাছে ছিলাম। তখন একজন ব্যক্তি এসে বললো - হে ইবনে আব্বাস! আমার জীবিকা আমার হাতের সৃজনের উপর। আমি ছবি আঁকি। তখন ইবনে আব্বাস - রাদিয়াল্লাহু আনহু - বললেন, আমি তোমার কাছে সেই কথা বর্ণনা করছি - যা আমি রাসুলুল্লাহ - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - কে বলতে শুনেছি।

আমি রাসুলুল্লাহ - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - কে বলতে শুনেছি যে -
'যে ব্যক্তি ছবি বানায়, আল্লাহ তায়ালা তাকে শাস্তি দিতে থাকবেন যতক্ষণ না সে উক্ত ছবিতে প্রাণ দিতে পারবে। আর সেই ব্যক্তি কোনদিন তাতে প্রাণ দিতে পারবে না।'

একথা শুনে লোকটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। আর তার চেহারা ফ্যাঁকাসে হয়ে গেলো। তখন ইবনে আব্বাস - রাদিয়াল্লাহু আনহু - বললেন, তুমি অবাধ্য হলে ধ্বংস অনিবার্য।

তবে তুমি যদি চিত্রশিল্প তৈরি করতে চাও, তাহলে গাছের ছবি আঁকো। আর প্রত্যেক ঐ বস্তুর ছবি আঁকো, যার প্রাণ নেই।' (সহিহ বুখারি-২১১২)

প্রাণী জগতের ছবি – প্রকার ও বিধান

যদি কোনো প্রাণীর ছবি কাগজ কাপড় দেয়াল ইত্যাদি উপাদানের উপর হাত দ্বারা অঙ্কন করা হয় – যেমনটা চিত্রশিল্পিরা করে থাকেন। যার নিজস্ব ছায়া থাকে না। শরীর থাকে না।

এভাবে কোনো প্রাণীর ছবি যদি ফটোগ্রাফির মাধ্যমে গ্রহণ করে প্রিন্ট করা হয়, তাহলে তা জায়েয হওয়া ও না হওয়া নিয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

প্রথম অভিমত – মানুষ ও সকল প্রকার প্রাণীর ছবি হারাম:

ফুকাহায়ে কেরামের বিরাট এক জামাত স্বার্বিকভাবে এই প্রকার ছবিকে হারাম বলে মত দিয়েছেন।

তার শরীর থাকুক বা না থাকুক। ছায়া হোক বা না হোক। হাত দ্বারা আঁকুক বা প্রিন্টেড ফটোগ্রাফি হোক।

যেমন আল মাউসুআতুল ফিকহিয়াতুল কুয়িতিয়্যাহ গ্রন্থে বলা হয় –

يحرم تصوير ذوات الأرواح مطلقا، أي سواء أكان للصورة ظل أو لم يكن وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وتشدد النووي حتى ادعى الإجماع عليه وفي دعوى الإجماع نظر يعلم مما يأتي وقد شكك في صحة الإجماع ابن نجيم

'প্রাণশীল সকল কিছুর ছবি সার্বিকভাবে হারাম। চাই তার ছায়া থাকুক বা না থাকুক। এটা হানাফি শাফিয়ি ও হাম্বালি মাযহাব।

ইমাম নববি এ ক্ষেত্রে খুব বেশি কড়াকড়ি করেছেন। এমনকি এর উপর ইজমা বা সকল ইমামের ঐক্যমত রয়েছে দাবি করেছেন।

কিন্তু তাঁর এই ইজমার দাবির উপর প্রশ্ন রয়েছে। পরবর্তী আলোচনা থেকে তা জানা যাবে।

ইবনে নুজাইম ইজমা সহিহ হওয়ার ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করেছেন।' (আল মাউসুআতুল ফিকহিয়াতুল কুয়িতিয়্যাহ – ১২/১০৫)

আরবের প্রসিদ্ধ ফিকাহ গবেষণা সংস্থা 'আল লাজনাতুত দায়িমা' এর আলেমগণ একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন –

التصوير الفوتوغرافي الشمسي من أنواع التصوير المحرم، فهو والتصوير عن طريق النسيج والصبغ بالألوان والصور المجسمة سواء في الحكم، والاختلاف في وسيلة التصوير وآلته لا يقتضي اختلافا في الحكم

'আলোকচিত্র বা ফটোগ্রাফি হারাম ছবির প্রকারভুক্ত। সূতা বা বিভিন্ন রঙ দ্বারা আঁকা ছবি এবং শরীর বিশিষ্ট প্রতিকৃতি সবকিছুই হুকুমের ক্ষেত্রে সমান।

ছবি তৈরি বা সৃজনের মাধ্যমে ভিন্নতার কারণে হুকুমের মধ্যে ভিন্নতার চাহিদা রাখে না।'(আল লাজনাতুত দায়িমা –১/৬৬৯)

প্রাণীর ছবি হারাম হওয়ার দলিল:

রাসুলুল্লাহ – সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম – বলেন –

(من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا)

'যে ব্যক্তি ছবি বানায়, আল্লাহ তায়ালা তাকে শাস্তি দিতে থাকবেন যতক্ষণ না সে উক্ত ছবিতে প্রাণ দিতে পারবে। আর সেই ব্যক্তি কোনদিন তাতে প্রাণ দিতে পারবে না।' (সহিহ বুখারি–২১১২)

অপর হাদিসে বলেন –

(أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله)

‘কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে থেকে তারা বেশি শাস্তি পাবে যারা আল্লাহর সৃজন শিল্প নিয়ে প্রতিযোগিতা করতো। (সহিহ বুখারি – ৫৬১০)

ইমাম বুখারি – রাহিমাহুল্লাহ – বর্ণনা করেন –

وعد النبي صلى الله عليه و سلم جبريل فقال – إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب

জিবরিল নবি কারিম – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম – ‘র সাথে প্রতিশ্রুতি করেন যে, আমরা সেই ঘরে প্রবেশ করি না যে ঘরে ছবি বা কুকুর থাকে। (সহিহ বুখারি – ৩০৫৫)

দ্বিতীয় অভিমত – হাতে ছবি আঁকা ও প্রিন্টেড ফটোগ্রাফি হালাল:

অন্য এক জামাত ফকিহ মনে করেন হাতে অঙ্কিত ছবি ও প্রিন্টেড ফটোগ্রাফি নিষিদ্ধ ছবির অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই এ প্রকার ছবি জায়েয রয়েছে।

যেমন সায়্যিদ সাবিক – রাহিমাহুল্লাহ – বলেন –

أما الصور التي لا ظل لها، كالنقوش في الحوائط وعلى الورق والصور التي توجد في الملابس والستور والصور الفوتر غرافية فهذه كلها جائزة. وكانت ممنوعة في أول الامر ثم رخص فيها بعد.

‘আর যে ছবির ছায়া নেই। যেমন দেয়াল কাগজের উপর অঙ্কিত ছবি বা কাপড় পর্দায় স্থাপিত ছবি এবং ফটোগ্রাফির ছবি সবকিছু জায়েয। ইসলামের প্রাথমিককালে ছবি নিষিদ্ধ ছিলো অতপর এ ব্যাপারে ছাড় দেওয়া হয়েছে।’ (ফিকহুস সুন্নাহ – ৩/৫০২)

ড. ইউসুফ আল কারদাভি – হাফিজাহুল্লাহ – বলেন –

تصوير اللوحات والتصوير الفوتوغرافي، فقد قدمنا أن الأقرب إلى روح الشريعة فيهما هو الإباحة أو على الأكثر الكراهة

‘বিভিন্ন জিনিসে অঙ্কিত ছবি ও ফটোগ্রাফি বৈধ হওয়াই হলো শরিয়তের চাহিদার অধিক কাছাকাছি। অথবা বেশি হলে মাকরুহ বলা যেতে পারে।’ (আল হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম – ১৫৭)

ফটোগ্রাফি সম্পর্কে মিশরের আরেক প্রসিদ্ধ মুফতি মুহাম্মাদ বখিত বলেন –

أن أخذ الصورة بالفوتوغرافيا الذي هو عبارة عن حبس الظل، بالوسائط المعلومة لأرباب هذه الصناعة ليس من التصوير المنهي عنه في شيء؛ لأن التصوير المنهي عنه هو إيجاد صورة، وصنع صورة لم تكن موجودة ولا مصنوعة من قبل، يضاهي بها حيوانا خلقه الله تعالى، وليس هذا المعنى موجودًا في أخذ الصورة بتلك الآلة

‘আলোর প্রতিবিম্বকে বিশেষ উপায়ে আটকে নেওয়ার দরুন সম্ভবপর হয়, সেই ছবি প্রতিকৃতির অন্তর্ভুক্ত নয় যা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।

কেননা নিষিদ্ধ ঘোষিত ছবি হলো এমন ছবি সৃজন করা যা পূবে ছিলো না যা বানানোর ফলে আল্লাহর সৃষ্ট কোনো জীবন্ত জিনিসের সাথে সাদৃশ্য করা হয়।

কিন্তু ক্যামেরার সাহায্যে গৃহীত ছবি সেই পর্যায়ে পড়ে না।’ (আল হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম – ১৩৭/১৩৮)

আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাতুল কুয়িতিয়্যাহ গ্রন্থে বলা হয় –

مذهب المالكية وبعض السلف، ووافقهم ابن حمدان من الحنابلة، أنه لا يحرم من التصاوير إلا ما جمع الشروطالآتية :

الأول : أن تكون صورة الإنسان أو الحيوان مما له ظل، أي تكون تمثالا مجسدا، فإن كانت مسطحة لم يحرم عملها، وذلك كالمنقوش في جدار، أو ورق، أو قماش
الثاني : أن تكون كاملة الأعضاء، فإن كانت ناقصة عضو مما لا يعيش الحيوان مع فقده لم يحرم، كما لو صور الحيوان مقطوع الرأس أو مخروق البطن أو الصدر
الثالث : أن يصنع الصورة مما يدوم من الحديد أو النحاس أو الحجارة أو الخشب أو نحو ذلك ، فإن صنعها مما لا يدوم كقشر بطيخ أو عجين لم يحرم

'মালিকি ও সালাফের অনেকের মাযহাব এবং হাম্বালি মাযহাবের বিন হামাদানও তাদের এই মত গ্রহণ করেছেন যে, ছবির মধ্যে নিম্নের শর্তগুলো না পাওয়া গেলে তা হারাম নয়।

প্রথম শর্তঃ মানুষ বা প্রাণীর ছায়া বিশিষ্ট ছবি হতে হবে। তাই যদি তা চ্যাপ্টা হয় তাহলে সেটা হারাম হবে না। যেমন দেয়াল কাগজ বা কাপড়ে অঙ্কিত ছবি।
দ্বিতীয় শর্তঃ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিপূর্ণ হতে হবে। যদি কোনো অঙ্গ অপূর্ণাঙ্গ থাকে যা না হলে প্রাণী বাঁচতে পারে না, তাহলে তা হারাম হবে না। যেমন মাথা কাটা বা পেট কিংবা বুকহীন প্রাণীর ছবি।
তৃতীয় শর্তঃ অঙ্কিত ছবি লোহা তামা পাথর কাঠ ইত্যাদি জিনিসের উপর স্থির হতে হবে। তাই যদি এমন কিছুতে ছবি আঁকা হয় যা স্থির নয় যেমন আখরোটের খোসা বা আটার গুলা ইত্যাদি তাহলে তা হারাম হবে না।' (আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাতুল কুয়িতিয়্যাহ – ১২/১০৪)

ছবি আঁকা হালাল ও কিছু দলিল:

রাসুলুল্লাহ –সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম – বলেছেন –

(إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة) قال بسر ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة فقلت لعبيد الله ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه و سلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال (إلا رقما في ثوب)

'যে ঘরে ছবি থাকে সে ঘরে ফেরেস্তা প্রবেশ করেন না।' বুসর বলেন অতপর একদিন যায়েদ বিন খালিদ অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরা তাকে দেখতে গেলাম। সেখানে গিয়ে তার দরজায় একটি পর্দার উপর ছবি রয়েছে দেখতে পেলাম।

তখন আমি উবায়দুল্লাহ খাওলানি নবিপত্নী মায়মুনার পালক পুত্রকে জিজ্ঞেস করলাম, যায়েদ কি বিগত দিনে ছবি (নিষিদ্ধের) সংবাদ দেয়নি? উবায়দুল্লাহ বললেন তুমি কি তাকে এটা বলেতে শুনোনি – 'তবে কাপড়ে অঙ্কিত হলে অসুবিধা নেই।' (সহিহ বুখারি –৫৬১৩)

আয়িশা – রাদিয়াল্লাহু আনহা – বলেন –

كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل إذا دخل استقبله فقال لى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حولى هذا فإنى كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا

'আমাদের একটি পর্দার মধ্যে পাখির ছবি ছিলো। বাহির থেকে কেউ ঘরে প্রবেশ করলে সেই ছবিটি চোখে পড়তো।

তাই রাসুল – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম – আমাকে বললেন এই ছবিটির মোড় ঘুরিয়ে দাও, কেননা আমি ঘরে প্রবেশের সময় এটি দেখে দুনিয়ার কথা স্মরণ হয়ে যায়।' (সহিহ মুসলিম – ৫৬৪৩)

এই হাদিসটি প্রমাণ করে প্রাণীর ছবি হারাম নয়। কেননা যদি তা হারাম হতো তাহলে রাসুল – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম – অবশ্যই ছবিটি নষ্ট করার নিদের্শ দিতেন।

কেবল দিক পরিবর্তন করার নির্দেশ দিয়ে ক্লান্ত হতেন না। অতপর তিনি ছবিটির দিক পরিবর্তনের কারণ বলে দিয়েছে যে, সেটা তাকে দুনিয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ছবি যদি শরয়ি নির্দেশে হারাম হতো তাহলে তিনি এই কারণ বর্ণনার প্রয়োজন ছিলো না। এই কথাকে ইমাম তাহাবির বক্তব্য শক্তভাবে সমর্থন করে।

ইমাম তাহাবি হানাফি বলেন –

إنما نهى الشارع أولا عن الصور كلها، وإن كانت رقما، لانهم كانوا حديثي عهد بعبادة الصور فنهى عن ذلك جملة، ثم لما تقرر نهيه عن ذلك أباح ما كان رقما في ثوب للضرورة إلى اتخاذ الثياب وأباح ما يمتهن، لانه يأمن على الجاهل تعظيم ما يمتهن وبقي النهي فيما لا يمتهن.

'শরিয়তের বিধনদাতা শুরুতে সর্বপ্রকার ছবি-প্রতিকৃতিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। কাগজ বা কাপড়ে অঙ্কিত চিত্র পর্যন্ত এর অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

কেননা তখনো মুসলিমরা মূর্তি-প্রতিকৃতি পূজা ছাড়ার খুব বেশি দিন অতিবাহিত হয়নি। তাই সার্বিকভাবে ছবি থেকে নিষেধ করা হয়।

অতপর ছবি নিষেধ হওয়ার ব্যাপারটি মুসলিমদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যাওয়ার পর কাপড়ের মধ্যে ছবি-নকশা অঙ্কনকে সাধারণ প্রয়োজনের তাগিদে তিনি বৈধ করে দেন।

এভাবে যে জিনিসকে সম্মানীয় মনে করা হয় না তার ছবিকেও বৈধতা দেওয়া হয়। কেননা জ্ঞানহীন ব্যক্তি থেকে সম্মানহীন জিনিসকে সম্মান দেখানোর আশংকা নেই।

তবে নিষিদ্ধের ঘোষণা বাকি থেকে যায় সেই সব বিষয়ের ছবির উপর যাকে সম্মানীয় মনে করা হয়।'
(শারহুল বুখারি, ইবনলু বাত্তাল – ৯/১৮০)

তৃতীয় অভিমত – ছবি আঁকা হারাম তবে ফটোগ্রাফি জায়েজ:

শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসাইমিন – রহিমাহুল্লাহ – সহ বেশ কিছু ফিকাহবিদ হাতে আঁকা সর্বপ্রকার প্রাণীর ছবি হারাম।

কিন্তু ক্যামেরা বা ফটোগ্রাফির মাধ্যমে গ্রহণ করা হলে বৈধ হবে বলে মত দিয়েছেন।

যেমন শায়খ সালেহ আল উসাইমিন বলেন –
أن يكون باليد فلا شك في تحريمه وأنه من كبائر الذنوب .القول بتحريم التصوير بالكاميرا أحوط، والقول بحله أقعد لكن القول بالحل مشروط بأن لا يتضمن أمرًا محرما

'(ছবি) হাতে অঙ্কন করা হলে তা হারাম ও কবিরা গোহান হওয়ার ব্যাপারে সংশয় নেই। ... ক্যামেরার মাধ্যমে গৃহীত ছবি হারাম হওয়ার মতটি অধিক নিরাপদ। আর তা বৈধ হওয়ার মতটি একটু নিম্নস্তরের।

কিন্তু বৈধ হওয়ার বিষয়টি কোনো হারাম জিনিস যুক্ত না হওয়ার শর্তের সাথে সংযুক্ত।' (মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িল, বিন উসাইমিন – ২/২৬৩)

ছবি আঁকা হারাম ও ফটোগ্রাফি হালাল হওয়ার দলিল

উক্ত মতের প্রবক্তাগণ বলেন –

فإن التصوير بالكاميرا لم يحصل فيه من المصور أي عمل يشابه به خلق الله تعالى وإنما انطبع بالصورة خلق الله تعالى على الصفة التي خلقه الله تعالى عليها ونظير ذلك تصوير الصكوك

والوثائق وغيرها بالفوتوغراف؛ فإنك إذا صورت الصك فخرجت الصورة لم تكن الصورة كتابتك بل كتابة من كتب الصك انطبعت على الورقة بواسطة الآلة فهذا الوجه أو الجسم المصور ليست هيئته وصورته

وما خلق الله فيه من العينين والأنف والشفتين والصدر والقدمين وغيرها، ليست هذه الهيئة والصورة بتصويرك أو تخطيطك بل الآلة نقلتها على ما خلقها الله تعالى عليه وصورها

'ক্যামেরার মাধ্যমে গৃহীত ছবি আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টির সাথে পাল্লা দেয় না। বরং তা আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টিকেই তার হুবহু গুণাগুনসহ তুলে ধরে। এর উপমা হলো ফটোগ্রাফের মাধ্যমে টাকার নোটের ছবি গ্রহণ করা।

কেননা টাকার নোটের ছবি তোলার পর যদি সেটা তুমি প্রিন্ট করো তাহলে তা তোমার নিজের বানানো নোট বলা যাবে না ।

বরং সেটা তৈরিকৃত একটি নোটকে যান্ত্রিক মাধ্যম অবলম্বন করার দ্বারা কাগজের উপর প্রকাশ মাত্র।

সুতরাং ক্যামেরার দ্বারা ধারণকৃত মুখ বা শরীরের ছবি বা চোখ নাক ঠোঁট বুক পা ইত্যাদির ছবি তোমার ছবি গ্রহণ বা কর্মের কারণে সৃষ্টি হচ্ছে না।

বরং একটি যান্ত্রিক মাধ্যম আল্লাহ তায়ালার সৃজন ও সৃষ্টিকে কেবল নকল করছে।' (মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িল, বিন উসাইমিন-২/২৬৫)

ফেসবুকে ছবি দেওয়া কি হারাম?

কোনো প্রাণীর ছবি ডিজিটাল ক্যামেরায় গ্রহণ করার পর তা মোবাইল লেপটপ টেলিভিশন বা ওয়েব পেইজ যেমন ফেসবুক ইউটিউব টুইটার ইত্যাদিতে দেখানো হয় তাহলে তা জায়েয রয়েছে বলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফিকাহবিদ মতামত দিয়েছেন।

যদিও কেউ কেউ সেটা জায়েয নয় বলেছেন। কিন্তু দালিলিকভাবে শক্তিশালী ও গ্রহণযোগ্য অভিমত হলো - ডিজিটাল ক্যামেরার মাধ্যমে গৃহীত ছবি মাল্টিমিডিয়া ও ওয়েব পেইজে প্রদশর্ন জায়েয।

যেমন শায়খ সালেহ আল উসাইমিন বলেন -

الصُّور بالطُّرُقِ الحديثة قسمان :الأول : لا يَكُونُ له مَنْظَرٌ ولا مَشْهَد ولا مظهر، كما ذُكِرَ لِي عن التصوير، بأشرطة الفيديو، فهذا لا حُكْمَ له إطلاقاً، ولا يَدْخُل في التحريم مطلقاً، ولهذا أجازه العلماء الذين يَمْنَعونَ التَّصوير على الآلة الفوتوغرافية على الورق وقالوا : إن هذا لا بأس به

'নব আবিষ্কৃত পন্থায় গৃহীত ছবি দুই প্রকার। প্রথম প্রকার হলো - তার দৃশ্য ও প্রকাশস্থান স্থিত হবে না।

যেমনটা আমাকে ভিডিও সম্পর্কে অবিহিত করা হয়েছে। তাই তার হুকুম ঢালাওভাবে দেওয়া যাবে না এবং সার্বিকভাবে হারামও হবে না।

এ জন্যই যেসব আলেম প্রিন্টেড ফটোগ্রাফি না জায়েয বলে মত দিয়েছেন তারাও বলেছেন এতে কোনো অসুবিধা নেই।' (ফাতাওয়া শায়খ সালেহ আল মুনাজ্জিদ -১/৩)

উল্লেখ্যঃ উপ-মহাদেশের কিছু আলেম এই প্রকার ছবি না-জায়েয হওয়ার পক্ষে মত দিলেও শায়খ তাকি উসমানি -হাফিজাহুল্লাহ- সহ অনেক আলেম এটাকে জায়েয বলেছেন।

ফেসবুকে ছবি দেওয়া জায়েজ – দালিল

শরিয়ত সেই ছবি-প্রতিকৃতিকে নিষিদ্ধ করেছে যার শরীর রয়েছে বা যা হাত দ্বারা অঙ্কন করা হয়। সেই ছবি একটা স্থানে স্থির থাকে।

কিন্তু মাল্টিমিডিয়া ও ওয়েব পেইজে দৃশ্যমান ছবি কোনো নির্দিষ্ট স্থানে স্থির থাকে না। সেটা লোকাল ডিস্ক বা হোসটিং সার্ভারে সুক্ষভাবে রক্ষিত থাকে।

সেখান থেকে ডাটা কলিংয়ের মাধ্যমে পর্দায় প্রর্দশিত হয়। তাই এই প্রকার ছবি নিষিদ্ধ ছবির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।

পেন টোলে আঁকা ছবি কি হারাম?

পেন টোল ও প্রাণীর ছবি পেন টোল নিয়ে কেউ আলাদাভাবে কথা বলেছেন বলে আমার চোখে পড়েনি।

যদিও পেন টোল নিয়ে আলাদাভাবে কথা বলার প্রয়োজন রয়েছে।

কেননা পেন টোলের সাহায্যে যে ছবি আঁকা হয় তা আলোকচিত্রশিল্পের মাধ্যমে গৃহীত ছবি নয়।

রবং তা পূর্ণাঙ্গরূপে হাতে আঁকা বা হাত দ্বারা সৃষ্ট ছবি।

পার্থক্য শুধু এতোটুকু যে, হাতে আঁকা ছবি আঁকা হয় কাগজে। যা একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্থির থাকে।

কিন্তু পেন টোলের মাধ্যমে সৃষ্ট ছবি একটি ডিজিটাল পেনের সাহায্যে অঙ্কন করা হয় ভার্চুয়াল পেইজে। যা স্থির থাকে না কেনো নির্দিষ্ট স্থান জোড়ে।

তাই এই ছবি প্রিন্ট হওয়ার আগ পর্যন্ত মাল্টিমিডিয়ায় বা ওয়েব পেইজে থাকা অবস্থায় জায়েয বলার যুক্তি থাকলেও প্রিন্ট হওয়ার পর তা জয়েয বলার কোনো যুক্তি বাকি নেই।

বিশেষ করে সেই মত অনুযায়ী যেখানে ফটোগ্রাফিকে আলোকচিত্রশিল্পের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার সৃষ্ট অবয়বকে গ্রহণ ও প্রদর্শন বলে যুক্তি দেখিয়ে সেটা জায়েয বলা হয়েছিলো।
তদুপরি এ বিষয়ে স্থির কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া যাচ্ছে না। এটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে।

যে সব শর্ত লঙ্ঘন হলে ছবি হারাম হবে:

ছবির ব্যাপারে ফকিহদের কিছুটা মতভেদ থাকলেও মৌলিক কিছু শর্তের উপর সকলের ঐক্যমত রয়েছে।

যার কোনো একটি শর্ত লঙ্ঘন হয়ে গেলে তা আর জায়েয থাকবে না।

এক –ছবি গ্রহণ ও প্রর্দশনের মধ্যে ছবির বিষয় বস্তুকে পূজা করা উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না। যদিও ছবির বস্তুটি আগুন সূর্য বা সৃষ্টি জগতের যে কোনো ক্ষুদ্র কিছু হোক না কেন।

দুই –ছবির বিষয় বস্তুকে সম্মান বা অতিভক্তি প্রদর্শন করা যাবে না। যেমন আমাদের দেশে রাজনৈতিক নেতা থেকে নিয়ে পীর মাশায়েখের ছবি নিয়ে অনেক বাড়াবাড়ি করা হয়ে থাকে। এটাও পূজার মতোই।
তিন– এমন কোনো বিষয় বস্তুর ছবি আঁকা বা প্রদর্শন করা যাবে না যা শরিয়া নিষিদ্ধ করেছে। যেমন নারীদের ছবি বা বিবস্ত্র পুরুষের ছবি বা কাউকে ব্যাঙ্গ করার ছবি ইত্যাদি।

ছবি নিষিদ্ধ হওয়া কারণ:

এক –একত্ববাদি বিশ্বাসের সংরক্ষণ ও মূর্তি পূজারিদের সাদৃশ্য পরিহার। কেননা এ সব ছবি প্রতিকৃতি মানুষকে শিরক ও বহু উপস্য গ্রহণ করার প্রতি টেনে নিয়ে যায়।
বংশপরম্পরায় মানুষ প্রকৃত উপাস্যকে ভুলে গিয়ে এ সব প্রতিকৃতিকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করে নেয়।

দুই –ছবি নির্মাতাকে এমন অহমিকা ও ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে মুক্ত রাখতে যাতে সে যেন এটা ভেবে না বসে যে – সে যেন নিজে একটি জিনিসকে সৃষ্টি করে নিয়েছে। বা সৃষ্টি কর্মে সে স্রষ্টার গুণ অর্জন করে নিয়েছে।
তিন –ছবি আঁকার পেশা গ্রহণ অনেক সময় মানুষকে অবৈধ ছবি যেমন নারী বা ব্যাঙ্গাত্বক ছবি ইত্যাদির প্রতি ধাবিত করে দেয়। এতে সামাজিক নানাবিদ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
চার –ছবি প্রতিকৃতি ভোগ বিলাস ও অহেতুক জীবন চারণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। চিত্রশিল্পের নেশা মানুষকে আল্লাহ থেকে গাফিল করে দেয়।
হাতে কোন প্রাণীর ছবি আঁকা, ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ-এটাই আসল কথা। এই নিবন্ধের কোথাও এই কথাটি পরিষ্কার করে বলা হয়নি। তার কারণ হচ্ছে বর্তমানে প্রতিদিন বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমান কারণে অকারণে কোটি কোটি ছবি তুলছেন তাদের হাতা থাকা সেল ফোনটি দিয়ে। তাই নিবন্ধকারের মত ধার্মিকরা একটা বিপদে আছেন। কী করবেন? একদিকে মহানবীর হাদিসকে মানতে হয় অন্যদিকে ছবি আঁকা বা ছবি তোলার প্রয়োজনীয়তাকেও অস্বীকার করতে পারছেন না। বলা যায় ছবি আঁকা বা তোলা সংক্রান্ত হাদিসগুলো বিশ্বের ৯৯.৯৯% মুসলমান (কিছু অতি পর্দানশীন মহিলা ছাড়া) প্রতিদিনই অমান্য করছেন। কারণ এটাতে তারা ক্ষতিকর কিছুই দেখছেন না। যদি ইসলামের জন্মলগ্নে ক্যামেরা থাকত তাহলে হয়ত এ ধরনের হাদিসগুলোর অস্তিত্বই থাকত না।

এতো কিছুর জেনেও আমরা ছবি তুলি এবং সেগুলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপলোড দেই। আমাদের বোনেরা আপলোড দিচ্ছে তাদের বেপর্দার ছুটি। যার ফলে শুধু দুনিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাই নয়। বরং আখেরাতকেও হুমকির মুখে রেখে যাচ্ছে। আল্লাহ আমাদের সঠিক পথ দেখান।

ছবি স্ক্যাম নিয়ে একটি কেইস স্টাডিঃ

সিপ্লাস প্রতিবেদক: এডিটিং করা অশ্লীল আপত্তিরক ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিয়ে সংঘবদ্ধ চক্রের চাঁদাবাজী করার মামলা ৬ সদস্য কে আটক করেছে পুলিশ।

আটককৃতরা হলেন, মোঃ শামসুল হক রানা (২৭), মাহবুব আলম রনি (২৮), মোঃ মোশারফ হোসেন টুটুল (২৮), মোঃ আফসার (২৯), মোঃ সুমন হোসেন প্রঃ সাদ্দাম (৩০), মোঃ রাজু (২৯)।

জানা যায়, পাহাড়তলী থানাধীন কাজী মসজিদ সংলগ্ন ডিপোতে জনৈক গোলাম মোহাম্মদ (৬৭) এর এডিটিং করা অশ্লীল আপত্তিরক ছবি তৈরি করার ভয় দেখিয়ে গত ২০ মার্চ সন্ধ্যা অনুমান ৬টার সময় ৩ লাখ টাকা কাজী মসজিদ সংলগ্ন ডিপো হতে চাঁদা গ্রহন করে এবং পরবর্তীতে আরো ৩ লাখ টাকা চাঁদা দাবী করে এবং না দিলে প্রাণনাশের হুমকি ও ব্যবসায়িক ক্ষতি সাধনসহ অন্য কোন ক্ষতি করবে বলে হুমকি দেয়। এসময় ভুক্তভোগি উক্ত দাবীকৃত টাকা দিতে অস্বীকার করিলে আসামীরা জনৈক ব্যক্তির মানহানি করার উদ্দেশ্যে এডিটিং করা আপত্তিকর ও অশ্লীল ছবি তৈরি করার ভয় দেখায়। এঘটনায় তিনি বাদী হয়ে পাহাড়তলী থানায় চাঁদা গ্রহন ও চাঁদা দাবীর মামলা রুজু হয়।

এ মামলায় নগরীর বিভিন্ন জায়গায় অভিযান পরিচালনা করে মোঃ শামসুল হক রানা (২৭), মাহবুব আলম রনি (২৮), মোঃ মোশারফ হোসেন টুটুল (২৮), মোঃ আফসার (২৯), মোঃ সুমন হোসেন প্রঃ সাদ্দাম (৩০), মোঃ রাজু (২৯)দেরকে গ্রেফতার করে।

জিজ্ঞাসাবাদে তারা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে। চাঁদা আদায়ের ১,২২,০০০/- টাকা উদ্ধার করা হয়।

মোবাইল নাম্বার সংগ্রহ করে হয়রানিঃ বর্তমানে মানুষ বিভিন্ন ভাবে হিংসাত্মক হয়ে উঠছে। অল্পতেই কেমন যেনো ক্রোধে ফেটে পরে। কারো ভালো টা সহ্য করতে পারে না। এগুলোর কারন ও কোথাও না কোথাও এই সামাজিক মাধ্যম। অনেকেই নিজের ব্যাক্তিগত সব কিছু সেয়ার করে ফেসবুকে। আবার অনেকে তো মিথ্যাটাও করে। কিন্তু দূর থেকে দেখে কেউ সত্যি টা উপলব্ধি করতে পারে না। তাই হিংসাত্মক হয়ে ক্ষতি করার চেষ্টা করে।

আর এই ক্ষতির একটা সূরত হলো মোবাইল নাম্বার সর্বোত্র ছড়িয়ে দেয়া। তখন আজেবাজে নানা জায়গা থেকে কল আসতে থাকে। এবং বিরক্ত হয়ে এক পর্যায়ে নাম্বার পরিবর্তন ছাড়া কোন উপায় থাকে না।



বদ নজরের হুমকিঃ আমরা অনেকে ফেসবুকে প্রোফাইল পিকচার হিসেবে বাচ্চাদের ছবি দিয়ে থাকি। এমনকি অনেক দ্বীনদার ভাই-বোনও এই কাজ করে থাকেন। বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে এটি লক্ষ্য করা যায়। অনেককে আবার দেখা যায় বাচ্চাকে হিজাব করিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে কোন সূরা তিলাওয়াত করার ভিডিও করে সোস্যাল মিডিয়ায় ছাড়েন।

এগুলো আমাদের দ্বীনি ভাই- বোনেরা ভালো নিয়তে করে থাকলেও কিছু ক্ষতিকর দিক রয়েছে।

প্রথমত, অধিকাংশ আলেমের মতে প্রয়োজন ছাড়া অতিরিক্ত ছবি তোলা উচিৎ নয়।

দ্বিতীয়ত, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাচ্চার ছবি বা ভিডিও ছাড়লে সেটি অনেক মানুষ দেখতে পায়। এতে বাচ্চার বজ নজর লাগতে পারে। আমাদের অনেকেরই একটি ভুল ধারণা আছে সেটা হলো,শুধুমাত্র সরাসরি দেখলেই বদ নজর লাগে। ধারণাটি ভুল সরাসরি না দেখে ছবি বা তার কন্ঠের মাধ্যমেও বদ নজর লাগতে পারে। আর ফেসবুকে তো বদ নজর দেওয়ার লোকের অভাব নেই।

আমরা যখন ফেসবুকে কোন বাচ্চার ছবি দেখি তখন বলে ফেলি, "বাচ্চাটি কি কিউট বা সুন্দর ইত্যাদি।" আর সাথে ফ্রি পোস্টে লাভ রিএ্যাক্ট, কমেন্ট আর শেয়ারতো আছেই।

মূল সমস্যাটি এইখানেই, শয়তান কখনও একজন মানুষ আরেক জনের প্রশংসা করুক এটা সহ্য করতে পারে না এমনকি নিজের ব্যতীত অন্য কোন কিছুর(গাছপালা,ফল-ফলাদি,বাড়িগাড়ি) কোন ধরনের প্রশংসা সহ্য করতে পারে না। ঠিক এই কারণে শয়তানকে জান্নাত থেকে বের দেখা হয়েছিল। আল্লাহ তা'লা যখন সৃষ্টি হিসেবে মানুষ অর্থাৎ আদম [আ.] এর প্রশংসা করেছিলেন তখন শয়তান এটা সহ্য করতে পারেনি। আল্লাহ তাকে সেজদাহ করতে বললে সে অহংকারী হয়ে তাকে সেজদাহ করেনি। এর পরিনতি হিসেবে তাকে জান্নাত থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল।

সারকথা এই যে, শয়তান আদম [আ.] এর প্রশংসা পছন্দ করে নাই আর সে আদম সন্তানেরও প্রশংসা পছন্দ করে না। যার কারণে আদম সন্তানের কারো প্রশংসা শুনলে শয়তান উক্ত প্রশংসার গুণাবলী নষ্ট করতে তৎপর হয়।

উদাহরণসরূপ: কোন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করলে, সেই রেজাল্টের প্রশংসা কেউ অবাক ভরে করলে, শয়তান পড়ালেখার জন্য যে গুণাবলী দরকার তা নষ্ট করে ফেলে। যেমন: মেধা-বুদ্ধি কমে হাওয়া।

আর যখন আমরা কারো প্রসংশা করি তখন শয়তান এটা সহ্য করতে না পেরে যার প্রশংসা করা হয় তার ক্ষতি করার জন্য লেগে পড়ে। এর ফলে বাচ্চার অদ্ভুত বা অস্বাভাবিক কিছু সমস্যা লক্ষ্য করা যায়।

যেমন : হঠাৎ করে ঘুমের মধ্যে কেঁদে উঠা,কোন কারণ ছাড়া প্রায় অসুস্থ থাকা,আচার-আচরণ অদ্ভুত পরিবর্তন বা অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা ইত্যাদি।

বিষয়টা স্পষ্ট করার জন্য একটা ঘটনা বলি, "এক ভাই তার বাচ্চা মেয়ের ছবি ফেসবুকে ছেড়েছিলেন। ছবি ছাড়ার কিছুদিন পর হঠাৎ করে বাচ্চাটি অসুস্থ্য হয়ে যায়। প্রায় বাচ্চাটি রাতে ঘুমের মধ্যে কেঁদে উঠত। তার আচারণেও কিছু অদ্ভুদ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। নিয়মিত কোন না কোন সমস্যা লেগেই থাকত। ডাক্তার দেখালেও কোন কাজ হয়নি। বাচ্চা খাবারও ঠিক মতো খেতো না এমনকি মায়ের বুকের দুধও না। এক সময় বাচ্চার শরীর শুকিয়ে যেতে থাকে, অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু ফেসবুকে ছবি ছাড়ার আগে কোন সমস্যা ছিল না। তারপর, এক ভাইয়ের পরামর্শে তিনি এক রাক্বীর সাথে যোগাযোগ করেন। তাকে সব ঘটনা খুলে বলেন। তিনি ফেসবুকে ছবি ছাড়ার কথা শুনে ছবিগুলো ডিলিট করতে বলেন এবং বাচ্চাটিকে রুকইয়াহ করেন। প্রয়োজনীয় কিছু পরামর্শ দেন এবং সেগুলো অনুসরণ করতে বলেন। আশ্চর্যজনক ভাবে কিছু দিনের মধ্যে বাচ্চার অবস্থার উন্নতি হতে থাকে এবং পরবর্তীতে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠে"।

বাচ্চার বদনজর কারণে এছাড়াও আরো কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে যেমন: মা-বাবার অবাধ্য হওয়া, চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া, জ্বর হওয়া,চোখের নিচে কালো দাগ পড়া, খাবারের প্রতি অনীহা, হঠাৎ করে আচারণে পরিবর্তন আসা, চেহারায় ছোপ ছোপ দাগ দেখা যায়, পড়ালেখার প্রতি অনীহা ইত্যাদি।

• আল্লাহ তা'লা বলেন,"কাফিররা যখন উপদেশ বাণী (কুরআন) শ্রবণ করে তখন তারা যেন তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তোমাকে আছড়িয়ে ফেলতে চায় এবং বলে, সে তো এক পাগল[14]।" [সূরা কলাম: ৫১]

হাফিজ ইবনে কাসির এর ব্যাখ্যায় বলেন,"তোমার প্রতি বদ নজর দিবে এবং তারা তোমাকে হিংসার প্রতিফলন ঘটিয়ে রুগী বানিয়ে দিবে যদি তোমাকে আল্লাহ হেফাযত না করেন।"[তাফসীর ইবনে কাসীর: ৪/৪১০]

• বদ নজর সম্পর্কিত কিছু হাদিস:

১. "বদ নজর সত্য।" [বুখারী: ১০/২১৩]

অর্থাৎ বদ নজরের বাস্তবতা আছে এবং এর কুপ্রভাব লেগে থাকে।

২. "কোন বস্তু যদি তাক্বদীরকে অতিক্রম করত তবে বদ নজর তা অতিক্রম করত।"[তিরমিযী: ২০৫৯]

তাহলে ভেবে বদ নজরের প্রভাব কত ভয়ংকর।

৩. "কোন ব্যক্তির যখন নজর লাগে তখন এত বেশি প্রভাবিত হয় যে, সে যেন কোন উঁচু স্থানে চড়ল অতঃপর কোন নজর দ্বারা হঠাৎ নিচে পড়ে গেল।" [শাইখ আলবানি সহীহ বলেছেন]

৪. "বদ নজর মানুষকে কবর পর্যন্ত পৌঁছে দেয় এবং উটকে পাতিলে।"[সহীহ আল জামেঃ ১২৪৯]

---

[14] sura kalam 51

অর্থাৎ মানুষের নজর লাগায় মৃত্যু বরণ করে, যার ফলে তাকে কবরে দাফন করা হয় এবং আর উটের নজর লাগলে সেটা মৃত্যুর পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যা জবাই করে পাতিলে রান্না করা হয়।

৫. "আমার উম্মতের মধ্যে তাক্বদীরের মৃত্যুর পর সর্বাধিক মৃত্যু বদ নজর লাগার কারণে হবে।" [বুখারী]

৬. "নবী মুহাম্মাদ [ﷺ] তার ঘরে এক মেয়ে শিশুর চেহারায় দাগ দেখে তিনি বলেছেন,তার চেহারায় বদ নজরের লক্ষন দেখা যাচ্ছে। তাকে ঝাড়-ফুঁক করাও।" [বুখারী : ১/১৭১,মুসলিম: ৯৭]

৭. "নবী মুহাম্মাদ [ﷺ] আসমা বিনতে উমাইসকে [রা.] বলেন,কি ব্যাপার আমার ভাইয়ের সন্তানদেরকে দুর্বল দেখছি,তাদের কি কিছু হয়েছে ? আসমা বিনতে উমাইস [রা.] বলেন, না, কিছু হয়নি তবে তাদের বদ নজর দ্রুত লেগে যায়। তিনি [ﷺ] তাদের দেখে বলেন,তাদের ঝাড়-ফুঁক করাও।" [মুসলিম : ২১৯৮]

· হাফিজ ইবনে হাজার [রহ.] বলেন, "বদ নজরের মূল বিষয় হচ্ছে কোন উত্তম বস্তুকে নিকৃষ্ট চরিত্রের ব্যক্তি হিংসার চোখে দেখে। যার ফলে সেই মানুষ অথবা যেকোন প্রাণী, যে কোন বস্তুর ক্ষতিসাধিত হয়।" [ফাতহুল বারী : ১০/২০০]

· বদ নজরের চিকিৎসা :

১. বাচ্চার সব ছবি বা ভিডিও ইন্টারনেট থেকে ডিলিট করে দিবেন।

২. কোন ব্যক্তির নযর লেগেছে তা যদি জানা যায়, তবে তাকে ওযু করতে বলতে হবে। অতঃপর উক্ত ওযুর পানি দ্বারা বদনযরে আক্রান্ত ব্যক্তিকে গোসল করাতে হবে। [সহীহ মুসলিম]

নিম্নলিখিত আয়াত ও দু'আ সমূহ পড়ে বদনযরে আক্রান্ত ব্যক্তিকে ঝাড়-ফুঁক করবে।

[১] সূরা ফাতিহা।

[২] আয়াতুল কুরসী (সূরা বাক্বারার ২৫৫নং আয়াত)।

[৩] সূরা বাক্বারার শেষের দুটি আয়াত (২৮৫ ও ২৮৬ নং আয়াত)।

[৪] সূরা ইখলাছ।

[৫] সূরা ফালাক।

[৬] সূরা নাস।

[৭] এই দু'আটি

بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ

“আমি আল্লাহর নাম নিয়ে তোমাকে ঝাড়-ফুঁক করছি- তোমাকে কষ্টদানকারী সকল বস্তু হতে, এবং প্রত্যেক ব্যক্তির অথবা হিংসুক ব্যক্তির নযরের অনিষ্ট থেকে। আল্লাহ্ তোমাকে আরোগ্য দান করুন। আল্লাহর নাম নিয়ে তোমাকে ঝাড়-ফুঁক করছি।” [বুখারী ও মুসলিম]

[৮] এই দু'আটি

أعُوذُ بِكَلِماَتِ اللهِ التاَّمَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطاَنٍ وَ هاَمَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

“আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণী সমূহের মাধ্যমে আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি সকল প্রকার শয়তান থেকে, বিষধর প্রাণীর অনিষ্ট থেকে এবং সকল প্রকার বদনযর থেকে।” [বুখারী]

[৯] এই দু'আটি

بِسْمِ اللهِ يُبْرِيْكَ ومِنْ كُلِّ داَءٍ يَشْفِيْكَ، ومِنْ شَرِّ حاِسِدٍ إذاَ حَسَدَ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِيْ عَيْنٍ

“আল্লাহর নামে শুরু করছি, তিনি তোমাকে মুক্ত করুন, প্রত্যেক অসুখ থেকে আরোগ্য দান করুন, প্রত্যেক হিংসুকের হিংসা থেকে এবং প্রত্যেক বদনযরের অনিষ্ট থেকে (মুক্ত করুন)। [মুসলিম]

• যদি জানা না যায় কার নজর লেগের তাহলে নিচের এই পদ্ধতি অনুসরণ করুন:

এক বালতি পানি নিন। দুই হাতের কবজি ডুবিয়ে উপরোক্ত দুআ/সুরা পড়ুন। পড়া শেষ হলে হাত উঠিয়ে ফেলুন। উক্ত পানি দিয়ে বাচ্চাকে গোসল করিয়ে দিন।

[১] দরুদ শরীফ সাত বার।

[২] সুরা ফাতেহা সাতবার।

[৩] আয়াতুল কুরসী সাতবার।

[৪]সুরা কাফিরুন সাতবার।

[৫] সুরা ইখলাস সাতবার।

[৬]সুরা ফালাক সাতবার।

[৭] সুরা নাস সাতবার।

[৮] পুনরায় দুরুদ শরীফ সাতবার।

এ পদ্ধতি টি বর্ণনা করেন মুফতী জুনায়েদ।

প্রথমে সাতদিনের জন্য রুকইয়াহ করুন যদি সমস্যা না কমে আরও সাতদিন করুন যদিও এতেও না কমে তাহলে আরও সাতদিন বাড়িয়ে নিন ইনশাআল্লাহ একুশ দিন করলে আপনি সুস্থতার পথে। পরে প্রতিদিন না পারলে সাপ্তাহিক এক দিন আপনি বদ নজরের গোসল করতে পারেন। [সময়ের সল্পতার কারণে ২ নং পদ্ধতি এক ভাইয়ের ফেসবুক টাইমলাইন থেকে নেয়া এবং আংশিক পরিবর্তন করা হয়েছে]

.

এখন থেকে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেকে নিজের বাচ্চার ছবি ব্যবহার করেন না ঠিকই কিন্তু অপরিচিত বাচ্চার ছবি ব্যবহার করে, এটি বর্জন করুন। কারণ, আপনার জন্য অপরিচিত ওই বাচ্চার বদ নজর লাগতে পারে।

বিজ্ঞাপন **:** বর্তমানে সব কিছুর বিজ্ঞাপনেই নারীদের ব্যবহার করা হচ্ছে। কোন কোন বিজ্ঞাপনে অশ্লীল ছবিও ব্যবহার করা হয়। রাস্তায় বা বাজারে এসব বিলবোর্ডের ব্যবহার আমাদের ইসলামী সংস্কৃতির বিরোধী। পর্দার বিধান আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে এসেছে। আর আমরা তা লঙ্ঘন করছি। এর ফলে রেইপ সহ সমাজে নানা ধরনের অপরাধ বৃদ্ধি পেয়েছে।

অথচ ইসলাম আমাদের পর্দার কথা বলেছে।

আজ আমাদের বোনেরা পর্দা না করেই জাহিলিয়াতের যুগের মতো নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়াচ্ছে।

ইসলামে পর্দার বিধানঃ ইসলাম বিশ্বজনীন এক চিরন্তন ও শাশ্বত পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ইসলামে রয়েছে নারীর সম্মান, মর্যাদা ও সকল অধিকারের স্বীকৃতি, রয়েছে তাদের সতীত্ব

সুরক্ষা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক কর্মসূচী। তাদের সম্মান, মর্যাদা ও সতীত্ব অক্ষুন্ন রাখতেই ইসলাম তাদের উপর আরোপ করেছে হিজাব বা পর্দা পালনের বিধান।

মূলত 'হিজাব বা পর্দা' নারীর সৌন্দর্য ও মর্যাদার প্রতীক। নারীর সতীত্ব ও ইজ্জত-আবরুর রক্ষাকবচ। নারী-পুরুষ উভয়ের চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার অতি সহজ ও কার্যকর উপায়।

এ বিধান অনুসরণের মাধ্যমে হৃদয়-মনের পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'এ বিধান তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ।' (সূরা আহযাব: ৫৩)

ইসলাম পর্দা পালনের যে বিধান আরোপ করেছে তা মূলত অশ্লীলতা ও ব্যভিচার নিরসনের লক্ষ্যে এবং সামাজিক অনিষ্টতা ও ফেতনা-ফাসাদ থেকে বাঁচার নিমিত্তেই করেছে। নারীদের প্রতি কোনো প্রকার অবিচার কিংবা বৈষম্য সৃষ্টির জন্য করেনি।

বরং তাদের পবিত্রতা ও সতীত্ব রক্ষার্থেই তাদের উপর এ বিধানের পূর্ণ অনুসরণ অপরিহার্য করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের

থেকে অপবিত্রতাকে দূরীভূত করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।' (সূরা আহযাব: ৩৩)

এ জন্য পর্দা-বিধান ইসলামী শরীয়তের পক্ষ থেকে সাধারণভাবে সমাজ-ব্যবস্থার এবং বিশেষভাবে উম্মতের নারীদের জন্য অনেক বড় ইহসান। এ বিধানটি মূলত ইসলামী শরীয়তের যথার্থতা, পূর্ণাঙ্গতা ও সর্বকালের জন্য অমোঘ বিধান হওয়ার এক প্রচ্ছন্ন দলিল।

মানবসমাজকে পবিত্র ও পঙ্কিলতামুক্ত রাখতে পর্দা বিধানের কোনো বিকল্প নেই। বিশেষ করে বর্তমান সমাজের যুবক ও তরুণ প্রজন্মকে রক্ষা ও নারীজাতির নিরাপত্তার জন্য পর্দা-বিধানের পূর্ণ অনুসরণ এখন সময়ের দাবি।

পর্দা-পরিচিতি: 'পর্দা' শব্দটি মূলত ফার্সী। যার আরবী প্রতিশব্দ 'হিজাব'। পর্দা বা হিজাবের বাংলা অর্থ- আবৃত করা, ঢেকে রাখা, আবরণ, আড়াল, অন্তরায়, আচ্ছাদান, বস্ত্রাদি দ্বারা সৌন্দর্য ঢেকে নেয়া, আবৃত করা বা গোপন করা ইত্যাদি।

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, নারী-পুরুষ উভয়ের চারিত্রিক পবিত্রতা অর্জনের নিমিত্তে উভয়ের মাঝে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত যে আড়াল বা আবরণ রয়েছে তাকে পর্দা বলা হয়।

আবার কেউ কেউ বলেন, নারী তার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ রূপলাবণ্য ও সৌর্ন্দয পরপুরুষের দৃষ্টি থেকে আড়ালে রাখার যে বিশেষ ব্যবস্থা ইসলাম প্রণয়ন করেছে তাকে পর্দা বলা হয়।

মূলত হিজাব বা পর্দা অর্থ শুধু পোশাকের আবরণই নয়, বরং সামগ্রিক একটি সমাজ ব্যবস্থা, যাতে নারী-পুরুষের মধ্যে অপবিত্র ও অবৈধ সম্পর্ক এবং নারীর প্রতি পুরুষের অত্যাচারী আচরণ রোধের বিভিন্ন ব্যবস্থা রয়েছে।

পর্দার বিধান: পর্দা ইসলামের সার্বক্ষণিক পালনীয় অপরিহার্য বিধান। কোরআন-সুন্নাহর অকাট্য দলীল প্রমাণাদির ভিত্তিতে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি বিধানাবলীর মতো সুস্পষ্ট এক ফরয বিধান।

আল্লাহ তায়ালাই এ বিধানের প্রবর্তক। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যখন তোমরা তাদের নিকট কিছু চাইবে তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এ বিধান তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ'। (সূরা আহযাব: ৫৩)

এ বিধানের প্রতি পূর্ণ সমর্পিত থাকাই ঈমানের দাবি। এ বিধানকে হালকা মনে করা কিংবা এ বিধানকে অমান্য করার কোনো অবকাশ নেই। কেননা ইসলামী শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধানের বিরোধিতা করার অধিকার কারো নেই।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আল্লাহ এবং তার রাসূল কোনো বিষয়ের নির্দেশ দিলে কোনো মু'মিন পুরুষ কিংবা কোনো মু'মিন নারীর জন্য সে বিষয় অমান্য করার কোনো অধিকার থাকে না। আর যে আল্লাহ ও তার রাসূলকে অমান্য করে সে অবশ্যই পথভ্রষ্ট।' (সূরা আহযাব: ৩৬)

পর্দার গুরুত্ব: পর্দার গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে নবী আপনি আপনার স্ত্রী, কন্যা ও মু'মিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের জিলবাবের একাংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সূরা আহযাব: ৫৯)

এ আয়াতে পর্দার সঙ্গে চলাফেরা করার গুরুত্ব উল্লেখ করা হয়েছে যে, পর্দার সহিত চলাফেরা করলে সবাই বুঝতে পারবে তারা শরীফ ও চরিত্রবতী নারী। ফলে পর্দানশীন নারীদেরকে কেউ উত্যক্ত করার সাহস করবে না।

প্রকৃতপক্ষে যারা পর্দাহীনভাবে চলাফেরা করে অধিকাংশ সময় তারাই ইভটিজিং ও ধর্ষণসহ নানা রকমের নির্যাতনের সম্মুখীন হয় এবং রাস্তাঘাটে তারাই বেশি ঝামেলার শিকার হয়। তাই নারীর সতীত্ব ও ইজ্জত-আবরু রক্ষার্থে পর্দার গুরুত্ব অপরিসীম।

হাদীস শরীফেও পর্দার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, নারী পর্দাবৃত থাকার বস্তু। যখন সে পর্দাহীন হয়ে বের হয় তখন শয়তান তার দিকে চোখ তুলে তাকায়। (তিরমিযী: ১১৭৩)

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, একদা তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে ছিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সাহাবীদের উদ্দেশ্যে) বললেন, মহিলাদের জন্য সর্বোত্তম বিষয় কোনটি? তারা চুপ হয়ে গেলেন। (কেউ বলতে পারলেন না)

অতপর আমি ফিরে এসে ফাতেমা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলাম, মহিলাদের জন্য সর্বোত্তম বিষয় কোনটি ? তিনি বললেন, কোনো পরপুরুষ তাকে দেখবে না (অর্থাৎ নারী পর্দাবৃত থাকবে)। তারপর আমি ঐ বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট উল্লেখ

করলাম। তিনি বললেন, নিশ্চয় ফাতেমা আমার অংশ, সে সত্য বলেছে)। (মুসনাদুল বাযযার: ৫২৬)

এতে পর্দার গুরুত্ব পরিস্ফুটিত হয়। আর পারিপার্শ্বিকতার বিবেচনায় বিবেকের দাবীও তাই। এছাড়াও পর্দা পালনের মাধ্যমে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় ও সম্মানিত হতে পারে।

কেননা হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা পর্দানশীনদের ভালোবাসেন। আর কোরআনে বলা হয়েছে, 'তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন ও সম্মানিত যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন।' (সূরা হুজুরাত: ১৩)

প্রকৃত অর্থে তাকওয়া সম্পন্ন বা মুত্তাকী হলো ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর নির্দেশসমূহ মেনে চলে। আর সর্বসম্মতিক্রমে পর্দা আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশ। যেহেতু পর্দা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য অবশ্য পালনীয় নির্দেশ সেহেতু পর্দা পালনের মাধ্যমে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত ও মর্যাদা সম্পন্ন হতে পারে।

এছাড়াও পর্দা-বিধান সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, এ বিধানের পূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে নারী ও পুরুষের নৈতিক চরিত্রের হিফাযত হয়। পারিবারিক ব্যবস্থা সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় হয়।

কারণ, পর্দা পালনের কারণে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে পরকিয়াবিহীন পবিত্র জীবন গঠিত হয় এবং চরিত্রহীনতা ও অবিশ্বাস তাদের থেকে বিদায় নেয়। তাই মুসলিম উম্মাহ অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য যে, দুনিয়া ও আখিরাতে পর্দার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

পর্দাহীনতার পরিণতি: মূলত পর্দাহীনতার কারণে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, নির্লজ্জতা, অপকর্ম ও ব্যভিচারের মতো নিকৃষ্ট পাপের সূচনা হয়। যার কারণে ইভটিজিং, ধর্ষণ ও যৌন

সন্ত্রাস প্রকট আকার ধারণ করে। ফলে নানা অঘটনসহ ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত হয়। যার বাস্তব চিত্র নিত্যদিনের সংবাদপত্র খুললেই চোখে পড়ে।

এছাড়াও পর্দাহীনতার কারণে পরকিয়া ও চরিত্রহীনতার মতো ঘৃণিত কর্মের সূত্রপাত হয়। যার ফলে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস উঠে যায়। এতে পরিবারে অশান্তি ও বিপর্যয় নেমে আসে। যার বাস্তবতা আজ আমাদের নখদর্পণে।

মূলত পর্দাহীন নারীরা হচ্ছে জগতের সবচেয়ে নিকৃষ্ট নারী। তাদের ব্যাপারে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে সবচে নিকৃষ্ট তারাই যারা পর্দাহীনভাবে চলাফেরা করে। (বায়হাকী: ১৩২৫৬)

তাই আমরা বলতে পারি যে, সুসভ্য ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী নারী কিছুতেই পর্দাহীন হতে পারে না। এমনকী অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে রসূলুল্লাহ (রা.) তাদেরকে লা'নত দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করিম (সা.) লা'নত (অভিশাপ) দিয়েছেন সেসব নারীদেরকে যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে। অর্থাৎ পর্দাহীনভাবে চলাফেরা করে। (আবু দাউদ: ৪০৯৭)

এছাড়াও পর্দাহীনতার কারণে আল্লাহর বিধানকে অমান্য করা হয়। আর এ অবাধ্যতার কারণে আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দুই শ্রেণীর জাহান্নামীদেরকে আমি দেখিনি (অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে সমাজে তাদের দেখা যাবে)। এক. এমন সম্প্রদায়, যাদের হাতে গরুর লেজের মত চাবুক থাকবে, আর সেই চাবুক দিয়ে তারা (অন্যায়ভাবে) মানুষকে প্রহার করবে।

দুই. এমন নারী, যারা পোশাক পরিধান করা সত্ত্বেও নগ্ন। তারা অন্যদেরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং নিজেরাও অন্যদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাদের মাথা হবে উটের হেলে পড়া কুঁজের মতো। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না, অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ অনেক অনেক দূর থেকেও পাওয়া যায়। (মুসলিম: ৫৪৪৫)

এ হাদীসে মূলত পর্দাহীনতার ভয়াবহ পরিণতির প্রতি ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছে যে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এমনকী জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।

এ বিষয়টি অন্যত্র আরো স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক. পিতা-মাতার অবাধ্যকারী। দুই. দাইয়ুস (অর্থাৎ এমন পুরুষ, যে তার অধীনস্ত নারীদেরকে পর্দায় রাখে না)। তিন. পুরুষের ন্যায় চলাফেরা করা নারী (অর্থাৎ বেপর্দা নারী)। (মুসতাদরাকুল হাকিম: ২৪৪)

এ হাদীস থেকে পর্দাহীনতার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে জানা যায় যে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি। তাই জান্নাত প্রত্যাশী কোনো নারী কিছুতেই পর্দাহীন হতে পারে

না। এ হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে, যেসব পুরুষ তাদের অধীনস্ত নারীদের পর্দায় রাখার চেষ্টা করে না, তাদের জন্যও অনুরূপ পরিণতি।

যেভাবে পর্দা পালন করতে হবে: একজন নারীর পর্দা পালনের তিনটি পর্যায় রয়েছে। যথা- গৃহে অবস্থানকালীন পর্দা, বাইরে গমনকালীন পর্দা এবং বৃদ্ধা অবস্থায় পর্দা।

কোরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রত্যেকটি পর্যায়ে পর্দা রক্ষা করে চলতে হবে। সামনে পর্দার তিনটি পর্যায় সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করা হল।

গৃহে অবস্থানকালীন পর্দা: নারীর প্রধান আবাসস্থল হলো তার গৃহ। সাধারণত গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করা নারীর জন্য শোভনীয়। এ জন্য আল্লাহ তায়ালা নারীদেরকে তাদের গৃহাভ্যন্তরে অবস্থানের নির্দেশ দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করো, প্রাচীন জাহেলী যুগের নারীদের ন্যায় নিজেদেরকে প্রর্দশন করো না। (সূরা আহযাব: ৩৩)

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, নারীর প্রকৃত অবস্থানক্ষেত্র হচ্ছে তার গৃহ। নারী প্রয়োজন ব্যতীত গৃহের বাইরে যাবে না বরং গৃহেই অবস্থান করবে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৬/৪০৯)

মূলত নারী নিজেকে যত সংযত ও আবৃত রাখে আল্লাহ তায়ালার কাছে সে ততোই প্রিয় হয়ে ওঠে। ইসলামের দৃষ্টিতে তার মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব ততোই উচ্চতর হয়ে ওঠে।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, নারী তার পালনকর্তার সর্বাধিক নিকটে তখনই থাকে যখন সে তার গৃহে অবস্থান করে। (সহীহ ইবনে হিব্বান: ৫৫৯৯)

তাই মু'মিন নারীদের উচিত গৃহাভ্যন্তরে এমনভাবে অবস্থান করা যাতে আত্মীয় বা অনাত্মীয় কোনো গায়রে মাহরাম বা পরপুরুষের দৃষ্টিতে সে না পড়ে। আর এভাবে গৃহে অবস্থান করার মাধ্যমেই পর্দার যথার্থতা অর্জিত হয়।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, যখন তোমরা তাদের (নবী পত্নীদের) কাছে কিছু চাইবে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এ বিধান তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ। (সূরা আহযাব: ৫৩)

এ আয়াতে বিশেষভাবে নবী-পত্নীদের কথা উল্লেখ থাকলেও এ বিধান সমগ্র উম্মতের জন্য ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য।

এ বিধানের সারমর্ম এই যে, নারীদের কাছ থেকে ভিন্ন পুরুষদের কোনো ব্যবহারিক বস্তু, পাত্র, বস্ত্র ইত্যাদি নেয়া জরুরী হলে সামনে এসে নেবে না, বরং পর্দার আড়াল থেকে চেয়ে নিবে।

এ নির্দেশনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নারীরা তাদের গৃহে অবস্থানকালীন মুহূর্তেও গায়রে মাহরাম বা পরপুরুষ, নিকটাত্মীয় হোক বা দূরাত্মীয় সকলের কাছ থেকে সম্পূর্ণ পর্দার আড়ালে অবস্থান করবে।

তবে প্রয়োজন হলে পর্দার আড়াল থেকেই কথা বলবে। আর পরপুরুষরাও পর্দার আড়াল থেকেই কথা বলতে হবে। এতে পর্দার অপরিহার্যতা পরিস্ফূটিত হয়।

আয়াতের শেষাংশে পর্দার গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, পর্দার এ বিধান পুরুষ ও নারী উভয়ের অন্তরকে মানসিক কুমন্ত্রণা থেকে পবিত্র রাখার উদ্দেশ্যে দেয়া হয়েছে।

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এস্থলে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পুণ্যাত্মা পত্নীদেরকে পর্দার বিধান দেয়া হয়েছে, যাদের অন্তরকে পবিত্র রাখার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা গ্রহণ করেছেন।

অপরদিকে যেসব পুরুষকে সম্বোধন করে এই বিধান দেয়া হয়েছে, তারা হলেন রাসূলে করীম (সা.) এর সাহাবায়ে কিরাম, যাদের মধ্যে অনেকের মর্যাদা ফেরেশতাগণেরও উর্ধ্বে।

কিন্তু এসব বিষয় সত্ত্বেও তাদের আন্তরিক পবিত্রতা ও মানসিক কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য পুরুষ ও নারীর মধ্যে পর্দার ব্যবস্থা করা জরুরী মনে করা হয়েছে।

(তাহলে বলুন তো) আজ এমন ব্যক্তি কে, যে তার মনকে সাহাবায়ে কিরামের পবিত্র মন অপেক্ষা এবং তার স্ত্রীর মনকে পুণ্যাত্মা নবী-পত্নীদের মন অপেক্ষা অধিক পবিত্র হওয়ার দাবি করতে পারে। আর এটা মনে করতে পারে যে, নারীদের সাথে তাদের মেলামেশা কোন অনিষ্টের কারণ হবে না! (তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন: ৭/১৯৫)

বহু বিশুদ্ধ হাদীস থেকেও প্রতিভাত হয় যে, উম্মাহাতুল মু'মিনীন বা নবীপত্নীরা সাধারণত তাদের গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করার মাধ্যমেই পর্দা পালন করতেন। আল্লাহ তায়ালা মু'মিন নারীদেরকেও অনুরূপভাবে পর্দা পালনের নির্দেশ দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, (হে নবী) মু'মিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তবে যা সাধারণত (অনিচ্ছা সত্ত্বে) প্রকাশিত হয়ে যায় তা ভিন্ন। তারা যেন ওড়না দিয়ে তাদের বক্ষকে আবৃত করে রাখে।

আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া অন্য কারো কাছে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফল হতে পার। (সূরা নূর: ৩১)

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, নারীরা মাহরাম পুরুষ অর্থাৎ এমন পুরুষ যাদের সঙ্গে

বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম বা নিষিদ্ধ, তারা ব্যতীত অন্য কোনো পুরুষের সামনে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারবে না। এতে পর্দার অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয়।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তোমরা নারীদের নিকট যাওয়া থেকে বিরত থাক। তখন এক আনসার সাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! দেবরের ব্যাপারে আপনার অভিমত কি ? তিনি বললেন, দেবর হচ্ছে মৃত্যুতুল্য। (বুখারী: ৫২৩২)

আলোচ্য হাদীসে ব্যবহৃত 'হামউ' শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে স্বামীর নিকটাত্মীয়। শব্দটির উদ্দেশ্য ব্যাপক। শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, স্বামীর যেকোনো দিকের ভাই, চাচা, মামা, খালু, ফুফা এবং তাদের প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে সন্তান। যেমন: দেবর, ভাসুর, চাচা শ্বশুর, মামা শ্বশুর, তাদের প্রত্যেকের ছেলে সন্তান ইত্যাদি।

ইমাম তিরমিযী, লাইস ইবনু সা'দ, আল্লামা কাযী ইয়ায ও তাবারী সহ বহু আলেম অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ নারীর জন্য তার দেবর, ভাসুর, চাচা শ্বশুর, মামা শ্বশুর ও তাদের ছেলেদের সামনে নিজেকে প্রদর্শন করা থেকে দূরে থাকতে হবে যেভাবে মৃত্যু থেকে দূরে থাকতে চায়।

আর এ ব্যাপারে সর্বোপরি কথা হলো, নারীরা তাদের গৃহে অবস্থানকালীন মুহূর্তে মাহরাম নয় এমন সকল পুরুষ থেকে পূর্ণ পর্দা রক্ষা করে চলবে। অর্থাৎ নারীরা এমনভাবে গৃহে অবস্থান করবে যাতে নিকটাত্মীয় বা দূরাত্মীয় কোনো গায়রে মাহরাম বা বেগানা পুরুষের নজরে সে না পড়ে। গৃহে অবস্থানকালীন মুহূর্তে এভাবে পর্দাবৃত থাকা নারীর জন্য অপরিহার্য।

বাইরে গমনকালীন পর্দা: বলা বাহুল্য যে, নারীদের জন্য গৃহের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। এজন্য ইসলাম প্রয়োজনে নারীকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) তার স্ত্রী হযরত সাওদা (রা.) কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, প্রয়োজনে তোমাদেরকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। (বুখারী: ৪৭৯৫)

মূলত ইসলাম একটি সর্বাঙ্গীন ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। তাই মানব প্রয়োজনের সকল দিকই ইসলামে বিবেচিত হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে পর্দাবৃত হয়েই বাইরে বের হতে হবে। কিছুতেই পর্দাহীনভাবে বের হওয়া যাবে না।

এ প্রসঙ্গে বিশ্বনবী (সা.) বলেন, নারী পর্দাবৃত থাকার বস্তু, যখনই সে পর্দাহীনভাবে বের হয় তখন শয়তান তার দিকে উঁকি মেরে তাকায়। (তিরমিযী: ১১৭৩)

আর পবিত্র কোরআনে নারীদেরকে বাইরে গমনকালীন মুহূর্তে পূর্ণ পর্দা পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালার সুস্পষ্ট নির্দেশ, 'হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রী, কন্যা এবং মু'মিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন (প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার সময়) তাদের (পরিহিত) জিলবাবের একাংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে

ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সূরা আহযাব: ৫৯)

এ আয়াতে নারীদেরকে বাইরে গমনের সময় তাদের পরিহিত জিলবাবের একাংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন, জিলবাব হলো নারীর এমন পোশাক যা দিয়ে তারা পুরো দেহ ঢেকে রাখে। অর্থাৎ বাইরে গমনের সময় দেহের সাধারণ পোশাক- জামা, পাজামা, ওড়না ইত্যাদির উপর আলাদা যে পোশাক পরিধান করার মাধ্যমে নারীর আপাদমস্তক আবৃত করা যায় তাকে জিলবাব বলা হয়। আমাদের দেশে যা বোরকা নামে পরিচিত।

এ থেকে বুঝা যায় যে, বাইরে গমনের সময় বোরকা পরিধান করে আপাদমস্তক আবৃত করে বের হওয়া আবশ্যক। আর আয়াতে জিলবাবের একাংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়ার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মাথা ও মুখমণ্ডল ঢেকে নেয়া। যা সাহাবী, তাবেয়ী ও নির্ভরযোগ্য মুফাসসিরদের তাফসীর থেকে প্রতিভাত হয়।

এ প্রসঙ্গে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ তায়ালা (এ আয়াতে) মুমিন নারীদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, প্রয়োজনে তারা যখন বাইরে যাবে তখন তারা যেন জিলবাব দিয়ে (পুরো দেহ আবৃত করার পর) তাদের মাথার উপর দিক থেকে তাদের মুখমণ্ডলও আবৃত করে নেয়। তবে তারা (চলাফেরার সুবিধার্থে) একটি চোখ খোলা রাখবে। (ইবনে কাসীর: ৬/৪৮২)

প্রখ্যাত তাবেয়ী মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (রহ.) বলেন, আমি আবীদাহ সালামানীহকে এ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম তখন তিনি তার মাথা ও মুখমণ্ডল ঢেকে নিলেন। অর্থাৎ তিনি বুঝিয়েছেন যে, এ আয়াতে (পুরো দেহ আবৃত করার পর) মাথা ও মুখমণ্ডল ঢেকে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (ইবনে কাসীর: ৬/৪৮২)

সাহাবী ও তাবেয়ীগণের পরবর্তী মুফাসসিরদের ব্যাখ্যার দিকে তাকালেও দেখা যায় যে, ইবনে জারীর তাবারী, ইবনে কাসীর, বায়যাবী, বাগভী, নাসাফী, সুয়ূতি, আবু বকর জাসসাস, মুফতি মুহাম্মদ শফিসহ সব তাফসীরকারকগণ এ আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যাই করেছেন।

অর্থাৎ সকলে একমত পোষণ করেছেন যে, এ আয়াতে নারীদেরকে তাদের চেহারাসহ আপাদমস্তক আবৃত করে বের হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে বাইরে গমনকালীন পর্দার অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয়।

আর এ ব্যাপারে সর্বোপরি কথা হলো, কোনো প্রয়োজনে নারীকে বাইরে যেতে হলে তখন তার জন্য আবশ্যক হচ্ছে চেহারাসহ গোটা দেহ আবৃত করে পূর্ণ পর্দার সঙ্গে বের হওয়া। যা সর্বসম্মতিক্রমে ফরয।

এক্ষেত্রে জিলবাব বা বোরকা পরিধানের মাধ্যমে আপাদমস্তক আবৃত করে নিবে। প্রয়োজনে চেহারা বা মুখমণ্ডলের জন্য আলাদা নিকাব ব্যবহার করবে। আর হাতের কব্জি ও পায়ের

গোড়ালীর জন্য মোজা পরিধান করবে। তবে চলাফেরার সুবিধার্থে রাস্তা-ঘাট দেখার জন্য শুধু চোখ খোলা রাখবে।

বৃদ্ধা অবস্থায় পর্দা: বয়স্ক নারীদের জন্য পর্দা পালনের ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা গ্রহণের অবকাশ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'অতিশয় বৃদ্ধা নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না, তাদের জন্য অপরাধ নেই, যদি তারা তাদের সৌর্ন্দয প্রদর্শন না করে তাদের অতিরিক্ত বস্ত্র খুলে রাখে। তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' (সূরা নূর: ৬০)

আয়াতের নির্দেশনা হল, যে বৃদ্ধা নারীর প্রতি কেউ আকর্ষণ বোধ করে না এবং সে বিবাহেরও যোগ্য নয় তার জন্য পর্দার বিধান শিথিল করা হয়েছে। গায়রে মাহরাম ব্যক্তিও তার কাছে মাহরামমের ন্যায় হয়ে যায়। মাহরামদের কাছে যেসব অঙ্গ আবৃত করা জরুরী নয়। বৃদ্ধা নারীদের জন্য গায়রে মাহরাম পুরুষদের কাছেও সেগুলো আবৃত করা জরুরী নয়।

এরূপ বৃদ্ধা নারীর জন্য বলা হয়েছে, মাহরাম পুরুষদের সামনে যেসব অঙ্গ খুলতে পারবে, গায়রে মাহরাম পুরুষদের সামনেও সেগুলো খুলতে পারবে। (তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন: ৬/৪৩৯)

এ ব্যাপারে সর্বোপরি কথা হলো, চরম বার্ধক্যে পৌঁছার কারণে যেসকল নারী বিবাহের উপযুক্ত নয় এবং যাদের প্রতি কারো আকর্ষণ সৃষ্টি হয় না, এ ধরনের বৃদ্ধা নারীর জন্যই এ বিধান। তাদেরকে এই সুবিধা দেয়া হয়েছে যে, গায়রে মাহরাম পুরুষের সামনে অন্যান্য নারীদেরকে যেমন আপাদমস্তক ঢেকে রাখতে হয়, তাদের জন্য তা জরুরী নয়।

এ রকম বৃদ্ধা নারীগণ তা ছাড়াই পরপুরুষের সামনে যেতে পারবে। তবে শর্ত হল, তারা তাদের সামনে সেজেগুঁজে যেতে পারবে

এক্ষেত্রে ইসলামী কথা সম্বলিত বিলবোর্ড ভাড়া করে বা নিজের বাসাবাড়ীতে অল্প খরচেই স্থাপন করা যেতে পারে। প্রিন্ট মিডিয়াতেও বিজ্ঞাপন হিসাবে ইসলামী মূলনীতির কথাগুলো প্রকাশ করা যেতে পারে। রাস্তার পাশে বা মোড়ে মোড়ে ইসলামের সুমহান বাণী সম্বলিত বিজ্ঞাপন স্থাপন করলে তা দাওয়াতের ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রাখতে পারে। সারাদেশে অসংখ্য মাদরাসা রাস্তার পাশে বিদ্যমান। এগুলোর পাশের রাস্তার দু'পাশে বিভিন্ন ইসলামী বাণীর ব্যানার, বিলবোর্ড স্থাপন করা যেতে পারে। 'মুসলিম ও কুফরীর মাঝে পার্থক্য হ'ল ছালাত','একটি আয়াত হ'লেও আমার পক্ষ থেকে প্রচার কর' 'মুমিনদের মধ্যেই সেই উত্তম যে স্ত্রীর কাছে উত্তম' প্রভৃতি বাণী সম্বলিত বিলবোর্ড রাস্তায় স্থাপন করা যায়। এছাড়া রাস্তায় রাস্তায় সফরের দো'আ ও সফরকে উৎসাহিত করার আয়াতগুলো বিলবোর্ডে লেখা যেতে পারে। অশ্লীলতার পরিণাম সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীছগুলো উল্লেখ করে বাজারে বিলবোর্ড স্থাপন করা যায়। এছাড়া স্টীকার, লিফলেট প্রভৃতি মসজিদের দেয়ালে, বাসে, ট্রেনে, লঞ্চে প্রভৃতিতে স্থাপন করে দ্বীনী দাওয়াত প্রচার করা যেতে পারে।

অফলাইন প্রতারনাঃ এতোক্ষণ আমরা দেখলাম অনলাইন প্রতারনার নানা কৌশন।কিন্তু প্রতারনা গুলো শুধু অনলাইন এই সীমাবদ্ধ নেই। অফলাইনেও এর প্রচলন ব্যাপক।যেমন ডলার চক্র, নানা প্রলোভন, খাবারে ভেজাল মেশানো, মজুদ করন করে রাখা, কৃষি জমিতে রাসায়নিক সার ইত্যাদি নানা হুমকির মাঝে চলছে আমাদের জীবন।

ডলারচক্রঃ

প্রযুক্তির আরেক ফাঁদ হলো ডলার চক্র। প্রলোভন দেখিয়ে লাখো টাকা হারিয়েছেন, এমন নিউজ পত্রিকায় প্রায় প্রতিনিয়তই পাওয়া যায়।



রহিম মিয়া রিক্সায় করে বাসায় ফিরছিলেন। পথিমধ্যে রিকসাওয়ালা ভয় ভয় আওয়াজে বললেন ভাই কিছু না মনে করলে আমার এই টাকা টা দেখবেন? রহিম মিয়া অবাক হয়ে বললেন আরে এ তো ডলার। কোথায় পেলেন? রিক্সা ওয়ালা বললো একলোক আমার রিক্সায় রেখে চলে গেলেন। রেখে দিন এটা। আমি ভাই মূর্খ মানুষ কি করবো এসব দিয়ে। লোভি মন সায় দিলো। এবং প্রতারক চক্রের ফাঁদে পা দিলেন রহিম মিয়া। রিক্সা ওয়ালা আরো জানালো এমন আরো কিছু আছে আমার কাছে। এগুলো কোথায় ভাঙ্গাতে হয় আমি তো জানি না। ভাই আপনি রেখে দিন সব গুলো বিনিময়ে আমাকে কিছু টাকা দিন। লক্ষ টাকা পাওয়ার লোভে রহিম মিয়া দিয়ে দিলো দশ হাজার টাকা। কিন্তু যখন ডলার ভাঙ্গাতে গেলো মিললো না একটি টাকাও। উল্টো পুলিশের কাছে আটক হয়ে এখন তিনি জেলে আছেন।(কাল্পনিক)

প্রথমআলো, ১৫ অক্টোবর ২০১৫ থেকে নেয়া এক রিপোর্টের আলোকে-

রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামে সস্তায় ডলার কিনতে এসে অনেকে প্রতারক চক্রের ফাঁদে পড়ছেন। এ চক্রের সদস্যরা পুলিশ সেজে ক্রেতাদের কাছ থেকে টাকা ও মুঠোফোন ছিনিয়ে নিচ্ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।
ভুক্তভোগী চারজন ও এলাকার ১০-১২ জনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, উপজেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামের এনামুল হকের নেতৃত্বে ওই গ্রামে একটি চক্র গড়ে সস্তায় ডলার কেনার লোভ দেখিয়ে লোকজনকে ওই গ্রামে নিয়ে আসেন। এরপর পুলিশ সেজে ডলার কিনতে আসা লোকজনের কাছ থেকে টাকা ও মুঠোফোন ছিনিয়ে নেন।
২ অক্টোবর কুড়িগ্রাম থেকে ডলার কিনতে আসা আতাউর রহমানসহ তিনজনের কাছ থেকে ওই চক্রের সদস্যরা ৫ লাখ ৩৪ হাজার টাকা ও তিনটি মুঠোফোন ছিনিয়ে নিয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আতাউর রহমান মুঠোফোনে বলেন, প্রতারক দলের লোকজন পুলিশের পোশাক ছাড়াও হাতকড়া ও পিস্তল সঙ্গে নেন। দেখে বোঝার উপায় নেই যে তাঁরা আসল পুলিশ নন। পরে জানতে পারেন তাঁরা আসল পুলিশ নন। বিষয়টি তিনি তারাগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানকে জানিয়েছেন।
ওই গ্রামে ডলার কিনতে এসে প্রতারণার শিকার আরও দুজন বলেন, তাঁরা ৫০ টাকায় এক ডলার কিনেছেন। প্রথমে নমুনা হিসেবে কম দামে ডলার দিয়ে প্রতারকেরা ক্রেতার আগ্রহ বাড়িয়ে তোলেন। পরে বেশি ডলার কিনতে লক্ষ্মীপুর গ্রামে গেলে ওই চক্রের সদস্যরা পুলিশের পোশাক পরে ডলার ও মূল্যবান জিনিস কেড়ে নিয়ে তাড়িয়ে দেন।
রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার হরিপুর গ্রামের নয়া মিয়া বলেন, তিনি রংপুর শহরে এক রিকশাচালকের কাছ থেকে কম দামে ডলার কেনার কথা জানতে পারেন। পরে দুই বন্ধুকে নিয়ে চার লাখ টাকার ডলার কিনতে এ বছরের ২০ জানুয়ারি লক্ষ্মীপুর গ্রামে আসেন। রিকশাচালকের দেওয়া ঠিকানা মোতাবেক পৌঁছাতেই এনামুল হক তাঁকে ডলার করে দেন। এরপর রাস্তায় গেলে সাত-আটজন পুলিশ এসে তাঁদের হাতে হাতকড়া পরিয়ে মারধর করে। সঙ্গে থাকা সব ডলার ও মুঠোফোন কেড়ে নেয়। ওই ঘটনায় ২১ জানুয়ারি তিনি এনামুল হকসহ ১২ জনকে আসামি করে তারাগঞ্জ থানায় মামলা করেন। কিন্তু টাকা ফেরত পাননি।
এ বিষয়ে গত মঙ্গলবার রাহুলের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়নি। তাঁর স্ত্রী লিপি বেগম বলেন, এনামুলের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ মিথ্যা।
তারাগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাপস সরকার বলেন, প্রতারণার অভিযোগে জানুয়ারি মাসে করা এক মামলায় এনামুলের কারাদণ্ড হয়। জামিনে বেরিয়ে এসে আবারও ডলার বিক্রির নামে লোকজনের সঙ্গে প্রতারণা শুরু করেছেন। খুব শিগগিরই তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এছাড়াও ডলারচক্রের আরেক রূপ হলো ডলার সিন্ডিকেট। ডলার মজুদ করে রাখা হয় এবং বাজারে পরবর্তীতে ডলারের সংকোচন দেখিয়ে চড়া দামে বিক্রি করা হয়।খাদ্যদ্রব্য বা নিত্যা প্রয়োজনীয় বস্তু মজুদ করে রাখা অথবা তা বাজার থেকে তুলে নিয়ে দাম বাড়ানো ইসলামে অবৈধ। হানাফি মাজহাব মতে মাকরূহে তাহরিমি (হারাম সমতুল্য) হলেও অন্যান্য মাজহাব মতে এটি হারাম।

এ ধরনের কাজে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং অনেক মানুষ দুর্ভোগে পড়ে। তাদের কষ্ট বাড়িয়ে দেয়।

তাই ইসলাম এ প্রকার কাজকে হারাম ঘোষণা করেছে। এ প্রসঙ্গে রাসুল (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি মুসলমানদের খাদ্যশস্য মজুদ রাখে, আল্লাহপাক তার ওপর দরিদ্রতা চাপিয়ে দেন।

' (আবু দাউদ, হাদিস নং : ৫৫)

ব্যবসায়িক পণ্য বিক্রি না করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে বর্ধিত মুনাফা আদায়ের প্রচেষ্টা একটি সামাজিক অপরাধ। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'যে খাদ্যশস্য গুদামজাত করে সে অভিশপ্ত।

' (ইবনে মাজাহ) তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি ৪০ দিনের খাবার মজুদ রাখে, সে আল্লাহর জিম্মা থেকে বেরিয়ে যায়। ' (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা : ২০৩৯৬) অন্য হাদিসে এসেছে : 'যে ব্যক্তি খাদ্যশস্য গুদামজাত করে সে অপরাধী। ' (আল মু'জামুল কাবির : ১০৮৬)

তবে গুদামজাত পণ্য যদি মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু না হয় কিংবা মানুষ এর মুখাপেক্ষী না হয় অথবা এসব পণ্য চাহিদার অতিরিক্ত হয় বা গুদামজাতকারী বর্ধিত মুনাফা অর্জনের অভিলাষী না হয়, তাহলে এসব অবস্থায় পণ্য মজুদ রাখা অবৈধ নয়।

সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে পাওয়া খবর টি নিচে আলোচনা করা হলো–

ডলার বাজার নিয়ন্ত্রণে সর্বাত্মক পদক্ষেপ নিচ্ছে সরকারের একাধিক সংস্থা। বাংলাদেশ ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক ও মানি চেঞ্জার্স প্রতিষ্ঠানগুলোয় গত বুধবার থেকে বিশেষ তদন্ত শুরু হয়েছে।

হস্পতিবার থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও নিজ নিজ ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় অনুসন্ধান করছে। খোলাবাজারে ডলারের দাম নিয়ে কারসাজি বন্ধে পুলিশের ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ (ডিবি) তদন্ত করছে।

ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই, ব্যাংকারদের সংগঠন এবিবিও এ বিষয়ে কাজ করেছে। বৃহস্পতিবার বাজার ডলারের প্রবাহ বাড়ানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য রেখেছেন।

এদিকে বাংলাদেশ ব্যাংক ও ডিবি তথ্য পেয়েছে একটি চক্র বাজার থেকে অপ্রয়োজনে ডলার কিনে মজুত করছে। দাম বাড়লে সেগুলো বাজারে বিক্রি করে মুনাফা লুটে নেওয়ার জন্যই এসব করছে। এজন্য তিনটি চক্রকে শনাক্ত করা হয়েছে।এর মধ্যে রয়েছে কয়েকটি ব্যাংক। যারা মুনাফার জন্য অপেশাদারি আচরণ করেছে। একটি ব্যাংক নগদ ১০৪ টাকায় কিনে ১০৮ টাকায় ডলার বিক্রি করছে বলেও তথ্য পেয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এছাড়া বেশকিছু ব্যাংক নগদ ডলার বেচাকেনার ক্ষেত্রে ২ থেকে ৩ টাকা মুনাফা করছে। দ্বিতীয় গোষ্ঠীর মধ্যে আছে, অসাধু মানি চেঞ্জার প্রতিষ্ঠান। তাদের মধ্যে অনেকেই এ কাণ্ডে জড়িত। তারাও ১০২ টাকা করে ডলার কিনে ১০৮ টাকায় বিক্রি করেছে। অনেকে অফিসিয়াল চ্যানেলে কম দামে ডলার কিনে খোলাবাজারে বেশি দামে বিক্রি করেছে। বাজারে সংকটের আভাস পেয়ে আগে থেকেই ডলার কিনে মজুত করেছে।

এভাবে এক ধরনের কৃত্রিম সংকট তৈরি করা হয়েছে। এতে বাজারে দাম বেড়েছে। এরপর এখন তারা কম দামে কেনা ডলার বেশি দামে বিক্রি করছে। তৃতীয় পক্ষ হচ্ছে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী।যারা মূলত ডলারকে চাল, ডালের মতো নিত্যপণ্য মনে করে এই ব্যবসায় নেমেছে। তারা ব্যাংক থেকে টাকা তুলে ডলার কিনে মজুত করছেন।এছাড়া কিছু ব্যাংক প্রভাবশালী ও নিকটজনের কাছে বেশি মাত্রায় ডলার বিক্রি করেছে। সেগুলোও নেওয়া হয়েছে বেআইনিভাবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও ডিবি এ বিষয়গুলো তদন্ত করছে।

এর আগে গত মে মাসে খোলাবাজারে ডলারের দাম বাড়লে একটি গ্রুপ বাজার থেকে ডলার কিনে মজুত করে। ওই সময়ে প্রতি ডলারের দাম ১০৪ টাকায় উঠেছিল। পরে তা কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও গোয়েন্দা সংস্থার হস্তক্ষেপে কমে আসে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র সিরাজুল ইসলাম বলেছেন, ডলার নিয়ে কারসাজি করলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা মানি চেঞ্জার্স প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া হবে। ডিবি থেকে বলা হয়েছে, ডলার মজুত করলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ব্যাংক নির্বাহীদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের (এবিবি) চেয়ারম্যান ও ব্র্যাক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সেলিম আরএফ হোসেন বলেছেন, একটি গোষ্ঠী বেআইনিভাবে ডলার মজুত করে বিপুল অঙ্কের মুনাফা হাতিয়ে নিচ্ছে। তারা পরিকল্পিতভাবে বাজার অস্থির করে তুলছে। এই গোষ্ঠীকে খুঁজে বের করে আইনের আওতায় আনা উচিত।

এফবিসিসিআই-এর সভাপতি জসিম উদ্দিন, বৈদেশিক মুদ্রাবাজার অস্থির করার পেছনে যেসব ব্যবসায়ী ও ব্যাংক দায়ী তাদের খুঁজে বের করে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। তিনি বলেন, ডলারের দাম বাড়ার কারণে এলসি খুলতে সমস্যা হচ্ছে। দ্রুত এই সমস্যা নিরসনের জন্য ব্যাংকগুলোর প্রতি পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান।

সরকারি সংস্থাগুলোর তৎপরতায় মানি চেঞ্জার্স ও খোলাবাজারে ডলারের দাম কিছুটা কমেছে। তবে ব্যাংকে আগের দামেই বিক্রি হচ্ছে। সম্প্রতি ব্যাংক ও খোলাবাজারে ডলারের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে।

খোলাবাজারে প্রতি ডলারের দাম গত মঙ্গলবার বেড়ে সর্বোচ্চ ১১২ টাকায় উঠেছিল। পরে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও ডিবি বাজারে অনুসন্ধান শুরু করলে এর দাম ১০৯ টাকায় নেমে আসে। বৃহস্পতিবার তা আরও কমে ১০৭ টাকায় নামে। ব্যাংকগুলোয়ও এখনো নগদ ডলার সর্বোচ্চ ১০৮ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। তবে বেশির ভাগ ব্যাংকে ১০৩ থেকে ১০৫ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে।

সূত্র জানায়, সাম্প্রতিক সময়ে বাজারে ডলারের সরবরাহ কমে যাওয়ায় চাহিদা বেড়ে যায়। এ কারণে ডলারের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। এতে বাজারে দাম বাড়ছে হু হু করে। এক বছরের ব্যবধানে আন্তঃব্যাংকে ডলারের দাম প্রায় ১০ টাকা বেড়েছে। এক বছর আগে প্রতি ডলার ছিল ৮৬ টাকা। এখন ৯৪ টাকা ৭০ পয়সা। আমদানির জন্য প্রতি ডলার ছিল ৮৬ টাকা ৫০ পয়সা। এখন ৯৪ টাকা ৭৫ পয়সা। খোলাবাজারে ডলার ছিল ৮৭ টাকা। এখন ১০৭ টাকা।

সূত্র জানায়, বুধবার থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ১১টি পরিদর্শক দল মাঠপর্যায়ে তদন্ত করছে। তারা বিভিন্ন ব্যাংক ও মানি চেঞ্জারগুলোতে গিয়ে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছে। এগুলো তারা এখন পর্যালোচনা করছে। পরিদর্শক দলের একটি অংশ বৃহস্পতিবারও বিভিন্ন ব্যাংক ও মানি চেঞ্জার্স প্রতিষ্ঠানে হানা দেয়।

পরিদর্শকদের সূত্রে জানা গেছে, কার্ব মার্কেট থেকে একটি গ্রুপ সংঘবদ্ধ হয়ে ডলার কিনছে। এমন তথ্যও পাওয়া গেছে, ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নগদ ডলার কিনেছে। অনেকের মধ্যে গুজব রয়েছে, ব্যাংকে টাকা থাকলে তার কোনো মূল্য থাকবে না।

মূল্যস্ফীতির কারণে টাকার মান অনেক বেশি কমে যাবে। যে কারণে তারা ডলার কিনে মজুত করছে।

খোলাবাজারে ডলার কেনাবেচায় কোনো নিয়ম নেই।

যে কারণে এখান থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বেশি তথ্য পাচ্ছে না। তবে ডিবি এ খাতে কাজ করছে। ইতোমধ্যে কারা ডলার কিনেছে, কেন কিনেছে, সেগুলো কি কাজে ব্যবহার করেছে-সংস্থাটি এসব তথ্যের অনুসন্ধান করছে। তাদের তৎপরতার পর এখন খোলাবাজারের ব্যবসায়ীদের দেখা মিলছে না। একই সঙ্গে খোলাবাজারে কেউ ডলার বিক্রি করতেও আসছেন না।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিদর্শনে নগদ ডলারের দাম বাড়ানোর নেপথ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাত রয়েছে বলে উঠে এসেছে। এর মধ্যে একটি ব্যাংক এক দিনের ব্যবধানে নগদ ডলারের দাম ৬ টাকা বাড়িয়েছে। তারা ১০৪ টাকা করে নগদ ডলার কিনে ১০৮ টাকা করে বিক্রি করছে। প্রতি ডলারে মুনাফা করছে ৪ টাকা। কয়েকটি ব্যাংক প্রতি ডলারে ৩ টাকা মুনাফা করার তথ্যও মিলেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এত মুনাফা করাকে অনৈতিক মনে করে।

সূত্র জানায়, ইতোমধ্যে বেশ কিছু এলসি খোলা হয়েছে যেগুলো অপ্রয়োজনীয়। ব্যাংকগুলো এলসি খোলার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা মানেনি। অনেক ব্যাংক নিজেদের কাছে ডলার থাকার পরও তা আন্তঃব্যাংকে বিক্রি করেনি। তারা ওইসব ডলার আগাম বিক্রি করেছে। যেগুলো পরে আবার নিজেরা কিনে কাজে লাগিয়েছে। এ ধরনের প্রবণতাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনৈতিক হিসাবে মনে করে।

ডলারের দাম বেশি রাখলে লাইসেন্স বাতিল-কেন্দ্রীয় ব্যাংক : ডলারের বাজারে কারসাজি প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা এক্সচেঞ্জ হাউজের লাইসেন্স বাতিলের হুঁশিয়ারি দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

বৃহস্পতিবার এফবিসিসিআইয়ের সভাপতি জসিম উদ্দিন তার সংগঠনের ৯ সদস্যকে নিয়ে দেখা করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আবদুর রউফ তালুকদারের সঙ্গে। ডলারের দামে এ অস্থিরতা ঠেকাতে উদ্যোগ নিতে গভর্নরকে অনুরোধ করেন এফবিসিসিআইয়ের প্রধান।

পরে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুখপাত্র সিরাজুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, ডলারের দাম বাড়িয়ে যেসব মানিচেঞ্জার ও ব্যাংক মুনাফা করেছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি বলেন, ডলার বাজার স্বাভাবিক রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংক কাজ করছে। এ কাজে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। জড়িতদের চিহ্নিত করতে অভিযান অব্যাহত থাকবে। অনিয়মের প্রমাণ পেলে প্রয়োজনে লাইসেন্স বাতিলও করা হবে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে যে আতঙ্কের কথা বলাবলি হচ্ছে, তা অমূলক বলে মনে করেন ব্যবসায়ীদের সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের সভাপতি জসিম উদ্দিন। তিনি মনে করেন, বাংলাদেশের রিজার্ভ যা আছে, সেটি ভালো। অনেক উন্নত দেশের চেয়েও দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা মজবুত।

তিনি বলেন, 'আমরা একটি অস্থিতিশীল পরিস্থিতির মধ্যে আছি। এটা ওভারকাম করতে পারলে সবকিছু স্বাভাবিক হবে। এমন অবস্থায় সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতা দরকার।'

আস্থার অভাবে অচল ডলার মার্কেট-এবিবি : আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে আস্থার অভাবের কারণে বাজার অস্থির করে সেখান থেকে কিছু গোষ্ঠী মুনাফা হাতিয়ে নিয়েছে। এ কারণে অস্থিতিশীল হয়ে উঠেছে ডলারের বাজার। এমন মন্তব্য করেছেন ব্যাংক নির্বাহীদের সংগঠন-অ্যাসোসিয়েশন অব

ব্যাংকার্স বাংলাদেশের (এবিবি) চেয়ারম্যান ও ব্র্যাক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সেলিম আরএফ হোসেন।

বৃহস্পতিবার ব্র্যাক ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে ব্যাংক খাত নিয়ে সমসাময়িক আলোচনা-সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি।

এবিবি চেয়ারম্যান বলেন, আন্তঃব্যাংক মুদ্রাবাজার বর্তমানে অচল। এটাকে সচল করতে হবে। চলমান ডলার বাজারের অস্থিরতায় হয়তো কোনো ব্যাংক বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করছে। এজন্য আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে আস্থা বাড়াতে হবে। তার মতে, আন্তঃব্যাংক লেনদেন ব্যবস্থা বৈদেশিক মুদ্রাবাজারের ক্ষেত্রে চালু করতে পারলে সংকট উত্তরণ সম্ভব।

এবিবি চেয়ারম্যান বলেন, দেশে ডলারের বাজার একেবারে 'ফ্রি ফ্লোর' (বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া) করা সম্ভব নয়। কিছুটা ম্যানেজ করতে হবে। আন্তঃব্যাংক মুদ্রাবাজার সচল, আস্থা ফিরিয়ে আনা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের দেওয়া নির্দেশনা বাস্তবায়ন হলে ডলারের বাজার স্বাভাবিক হবে বলে মনে করেন তিনি।

এবিবি চেয়ারম্যান জানান, সাম্প্রতিক সময়ে ঋণ পুনঃতফসিল ও পুনর্গঠনে জারি করা বাংলাদেশ ব্যাংকের মাস্টার সার্কুলারের ফলে ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ কমবে। পাশাপাশি ব্যাংকগুলোতেও জবাবদিহি ও সুশাসন নিশ্চিত হবে।

ডলার মজুত করলে ব্যবস্থা-ডিবি : ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) প্রধান ও অতিরিক্ত কমিশনার মোহাম্মদ হারুন-অর রশিদ বলেছেন, বেআইনিভাবে বাজার থেকে ডলার কিনে মজুত করলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে বৃহস্পতিবার দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে এমন হুঁশিয়ারি দেন ডিবির প্রধান। তিনি বলেন, যদি এ ধরনের তথ্য পাওয়া যায় যে, কেউ ডলার মজুত করছে বা অবৈধভাবে জাল ডলার তৈরির সরঞ্জাম অথবা মেশিন আছে, তাহলে অবশ্যই অভিযান পরিচালনা করা হবে এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

বিকাশ প্রতারনা ও সতর্কতাঃ বর্তমান প্রযুক্তির নতুন আরেক সহায়াক মাধ্যম হলো বিকাশ বা মোবাইল ব্যাংকিং।সমস্যা টা বিকাশ এর নয় । বিকাশ কে ব্যবহার করে কিছু লো

তৈরি করছে প্রতারনার ফাঁদ। আর সেই ফাঁদে পা ফেলছে অনেক

সাধারন জনগন । এবং তাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের কাছের

আপন জন । আর এই প্রতারনার ফাঁদ থেকে বাচতে হলে চাই

সচেতনতা । কিছু বিষয় আগে থেকেই জানা থাকলে প্রতারনার ফাঁদ থেকে অনেকেই বেচে যাবে । তাই আপনজন দের জানাতে ভুলবেন না বিকাশ প্রতারনা ও সতর্কতা সম্পর্কে । চলুন দেখে নেয়া যাক সবিস্তার. –

বিকাশ প্রতারনার ধরনঃ

আগেই বলেছি বিকাশ প্রতারনা করছেনা, কিছু lok bKash ব্যবহার করে প্রতারনা করছে।

৩০০০ টাকা bkash নিজের মোবাইলে নেবার এক থেকে দেড় ঘন্টা পর একটি ফোন এলো ।

ফোনে : ভাই ভুল করে অন্যকে টাকা পাঠাতে গিয়ে আপনার একাউন্টে টাকা পাঠিয়েছি । ভাই দেখেন তো বিকাশের কোন ম্যাসেজ পাইলেন কিনা । আমার টা চলে এসেছে যে আপনার নাম্বারে চলে গেলে । একটু পরে আপনার ও আসবে ।

আমি : ভাই কোন টাকা আসেনি, আমি ব্যলেন্স চেক করে জানাচ্ছি।

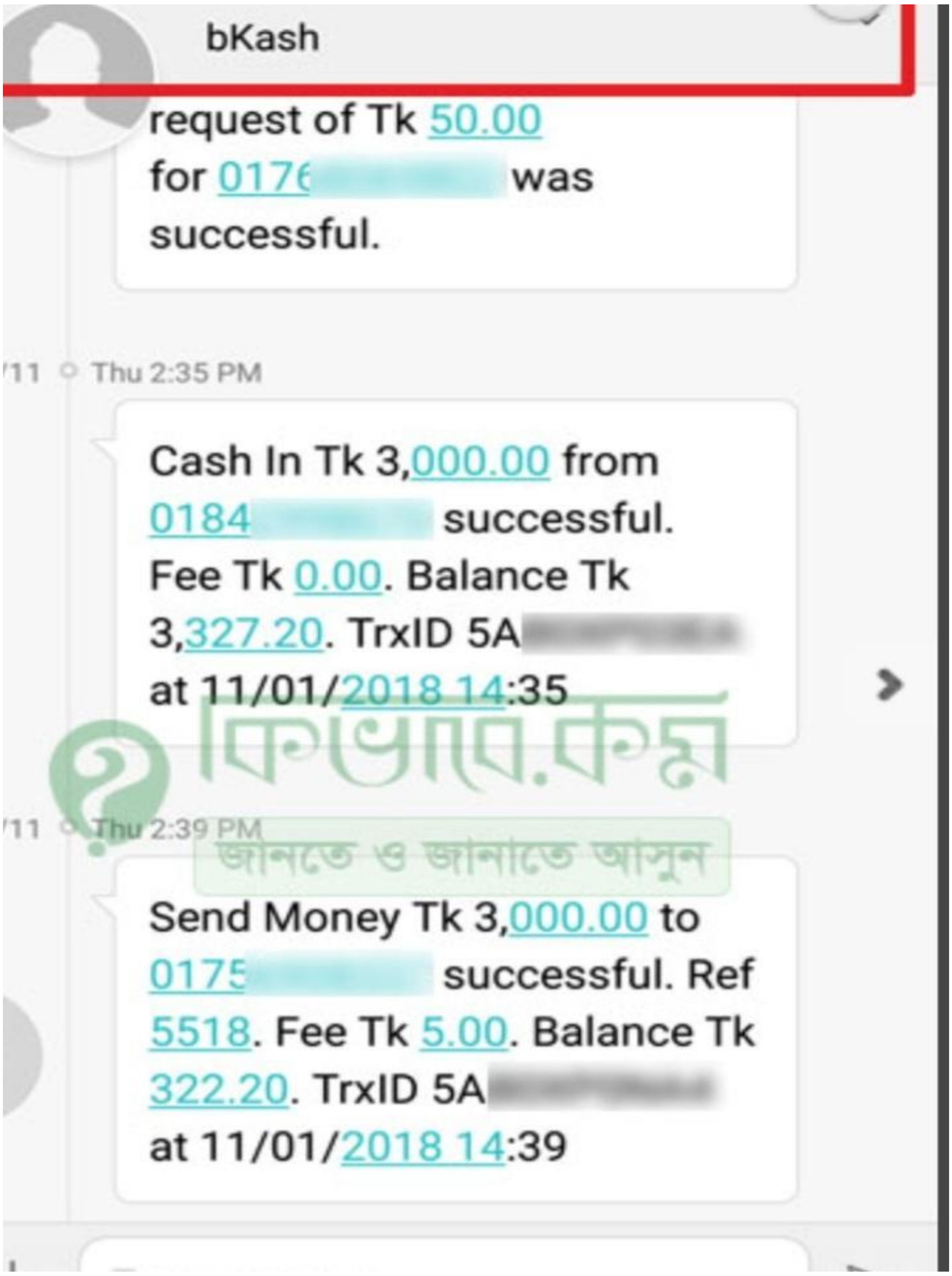
প্রথমে ধরেই নিয়েছিলাম যে হয়তো ভুল করেছে । কিন্তু আমি

ব্যালেন্স চেক করবো বলেছি বলে বোধহয় আর নক করলোনা তখন।

দ্বিতীয় রাত সাড়ে সাতটায় এলো ফোন....

ফোনে : ভাই আপনি আজ আমাদের এখান থেকে ৩০০০ /= নিয়েছিলেন বিকাশে । আমি : জি, আজ আমার মোবাইলে নিয়েছিলাম, (ক্লাসে ছিলাম, তেমন কনসেন্ট্রেট করা হয়নি)।

ফোনে : ভাই একজনকে টাকা পাঠাতে গিয়ে আপনার নাম্বারে ভুলে পাঠিয়েছি । খরচ সহ ২৫৫০ টাকা, আপনি ভাই প্লিজ ২৫৪০ টাকা পাঠিয়ে দেন এই নাম্বারে । ভাই যার কাছে টাকা পাঠানোর কথা তার একজন মেডিকেলে ভর্তি আছে । কিছুক্ষনের মধ্যেই আপনার ওখানে বিকাশের ম্যাসেজ ডুকবে ভাই ... ম্যাসেজ এলো নিচের মতো ...



এমনিতেই মনে হয়েছিলো ফাদ পাতা হচ্ছে এবং ম্যাসেজ পেয়ে কনফার্ম হলাম । কারন ৩০০০ টাকা আমি আগেই ব্যবহার করে ফেলেছি। আবারো ফোন এলো ... তো সে আলাপ চারিতা আর না তুলে ধরলেও চলবে । প্রতারক চক্র প্রথমে ফোন দিয়ে আমার কারেন্ট bKash Balance জানার চেষ্ঠা করেছে এবং সেই অনুসারে ফেইক ম্যাসেজ পাঠিয়েছে।

বিকাশ প্রতারনা – র আর এক ধরন

জিনের বাদশা কিংবা পুরস্কারের লোভ

যাঝে মাঝে আপনাকে জিনের বাদশা ফোন দেবে এবং অনেক উপদেশ কিংবা মঙ্গল বার্তা শুনিয়ে আপনার কাছে টাকা চাইবে কিংবা আপনার ফোনের কিছু কোড চাপতে বলবে । কিংবা আপনাকে জানানো হবে যে আপনি আপনি বিশাল এক পুরস্কার জিতেছেন, তো নিচের ধাপ গুলো ফলো করলে পেয়ে যাবেন সেই পুরস্কার । ধরা দিয়েছেন তো মরেছেন ।

বিকাশ প্রতারনা থেকে বাচার জন্য

সতর্কতা ও সচেতনতা

বিকাশের ম্যাসেজ সেন্ডার চেক করুন । এমন কি নিজের একাউন্ট এ ব্যালেন্স নেবার সময় ও কারন বিকাশ থেকে যে ম্যাসেজ গুলো আসলে সেটির সেন্ডার bKash হয় ।

প্রথম ছবিটিতে দেখুন একটি রবি নাম্বার থেকে পাঠানো হয়েছিলো বিকাশের ম্যাসেজ যেটি ফ্রড । আর ২য় ছবিটিতে সবগুলো ই এসেছে bKash থেকে।

■ আপনার কারেন্ট ব্যালেন্স জানাবেন না এবং আপনার একাউন্ট এর আগের Balance এর সাথে মিলিয়ে নিন নতুন ব্যলেন্স এর যোগ ফল ।

■ অন্যের বলা নির্দেশনায় আপনার মোবাইলের বাটন চাপা শুরু করবেন না

-

পুরস্কার নেবার লোভেও টাকা পাঠাবেন না ।

কাস্টমার কেয়ারের নাম নিয়ে বললেও পিন বা ব্যালেন্স জানাবেন না । প্রয়োজনে নিজে কাস্টমার কেয়ারের কল দিয়ে সাপোর্ট নিন । কাস্টমার কেয়ারের কল গুলো সব সময় এক নাম্বার থেকেই আসে, এলোমেলো নাম্বার না ।

যারা ইন্টারনেট ব্যবহার করেনা তাদের ও জানিয়ে দিন বিষয়গুলো, হয়তো গল্প করতে করতেই । হয়তো আপনার কারনেই সেই সাধারন মানুষগুলো প্রতারনার হাত থেকে বেচে যাবে।

ইসলামে প্রতারনার শাস্তিঃ

ধোঁকা দেওয়া কিংবা প্রতারণা করা ইসলামে নিষিদ্ধ। আদর্শ বিবর্জিত ইসলামে নিষিদ্ধ এ কাজটি দুনিয়ার প্রচলিত নিয়মেও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ইসলামি শরিয়তে ধোঁকা বা প্রতারণায় ৩টি মারাত্মক অপরাধ সংঘটিত হয়। এ কারণে ধোকাবাজ সম্পর্কে কঠিন ঘোষণা দিয়েছেন স্বয়ং বিশ্বনবি। একাধিক হাদিসে তিনি বলেছেন–

১. مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

'যে আমাদের ধোঁকা দেয় সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।' (মুসলিম)

২. অন্য হাদিসে প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেছেন, 'এরূপ করাও প্রতারণা যে– তোমরা ক্রেতাকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে দাম বাড়াবে না।'

৩. মানুষকে কেনা-বেচায় ধোঁকা দিতে নিষেধ করেছেন বিশ্বনবি। হাদিসে পাকে এসেছে–

'বাজারে পৌঁছার আগেই (অল্প দামে) কেনার জন্য ব্যবসায়ী কাফেলার সঙ্গে সাক্ষাৎ (শলা-পরামর্শ) করবে না। পশুর স্তনে দুধ জমিয়ে রাখবে না এবং কেউ অন্যের পণ্য চালানোর জন্য প্রতারণার অপচেষ্টা করবে না।' (তিরমিজি)

শুধু তা-ই নয়, বেচার সময় ওজনে কম দেওয়া এবং নেওয়ার সময় ওজনে বেশি নেওয়া দুনিয়া ও পরকালের জন্য মারাত্মক অপরাধ। এ সম্পর্কে কোরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা এসেছে–

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ - الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ - وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ - أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ - لِيَوْمٍ عَظِيمٍ - يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ - كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ [15]

'যারা মাপে কম করে, তাদের জন্যে দুর্ভোগ, যারা লোকের কাছ থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পূর্ণ মাত্রায় নেয় এবং যখন লোকদেরকে মেপে দেয় কিংবা ওজন করে দেয়, তখন কম করে দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে। সেই মহা দিনে, যেদিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্ব

[15] sura mufoffifin 1to 7

পালনকর্তার সামনে। এটা কিছুতেই উচিত নয়, নিশ্চয়ই পাপাচারীদের আমলনামা সিজ্জিনে আছে।' (সুরা মুতাফফিফিন : আয়াত ১-৭)

ধোঁকা-প্রতারণা এক মারাত্মক ব্যাধি। রাষ্ট্রীয় আইনেও এটি জঘন্য অপরাধ। দেশের প্রচলিত আইনে ৪১৫ ও ৪২০ ধারায় এ অপরাধ চিহ্নিত। এ ছাড়াও ৪০৬, ৪০৮ এবং ৪০৯ ধারায় বিশ্বাস ভঙ্গের অপরাধ দমন করা হয়। ধোঁকা-প্রতারণায় ৪২০ ধারায় সবচেয়ে বেশি মামলা হয়। এ আইনে যার শাস্তি সর্বোচ্চ ৭ বছর কারাদন্ড ও অর্থদন্ডের বিধান রয়েছে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে এসব অপরাধে ১০ বছর পর্যন্ত কারদন্ড ও অর্থদন্ডের বিধান রয়েছে।

আর ইসলামি শরিয়তে ধোঁকা বা প্রতারণায় ৩ ধরনের অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে। যার প্রতিটি মারাত্মক অপরাধ বলে বিবেচিত। তাহলো-

১. হারাম

প্রথমত এটি নীতি বিবর্জিত হারাম কাজ হলো ধোঁকা বা প্রতারণা। হারাম ও অনৈতিক কাজ হওয়ার কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা দিয়েছেন-

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

'যে ব্যক্তি ধোঁকা দেয় বা প্রতারণা করে সে আমাদের (মুসলিমদের) অন্তর্ভূক্ত নয়।' (মুসলিম)

২. হক্কুল ইবাদ নষ্ট

দ্বিতীয়ত অন্যায়ভাবে কারো ক্ষতি করা কিংবা প্রতারণার মাধ্যমে অন্যের সম্পদ গ্রাস করার কারণে এটি হক্কুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার হরণের শামিল। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি অনেক ভয়ংকর অপরাধ। যে অপরাধ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না।

যার হক নষ্ট করা হবে তার সঙ্গেই সমঝোতা করতে হবে। ধোঁকা-প্রতারণায় বান্দার হক নষ্ট করার যথাযথ সমাধানে ব্যর্থ হলে পরকালে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে। ফলে পরকালে বিচারের দিন মহান আল্লাহ ন্যায় বিচারের মাধ্যমে ধোঁকা বা প্রতারণাকারীর নেকিগুলো যার সঙ্গে ধোঁকা দেওয়া বা প্রতারণা করা হয়েছে তাকে দিয়ে দিতে হবে। এখানেই শেষ নয়- প্রতারিত ব্যক্তির গোনাহগুলো ধোঁকাবাজ-প্রতারকের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হবে। সুতরাং ধোঁকাবাজ-প্রতারক হয়ে পড়বে আমলহীন-নিঃস্ব। অবশেষে প্রতারক ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষেপিত হবে।

আর যদি প্রতারক বা ধোঁকা দেয়া ব্যক্তি দুনিয়ায় প্রতারণার সম্পদ ও সংঘটিত বিষয়ের সমাধান করে ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে সে এ অপরাধ থেকে মুক্ত হবে। পরকালের এ ভয়াবহ অবস্থা থেকে মুক্তি পাবে।

৩. শান্তি বিনষ্টকারী অপরাধ

তৃতীয়ত ধোঁকা-প্রতারণা প্রচলিত আইনের লঙ্ঘন ও শান্তি বিনষ্টকারী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। দেশের প্রচলিত আইনে ৪১৫ ও ৪২০ ধারায় এ অপরাধ চিহ্নিত। এ ছাড়াও ৪০৬, ৪০৮ এবং ৪০৯ ধারায় বিশ্বাস ভঙ্গের অপরাধ দমন করা হয়। ধোঁকা-প্রতারণায় ৪২০ ধারায় সবচেয়ে বেশি মামলা হয়। রাষ্ট্রীয় আইনে যার শাস্তি সর্বোচ্চ ৭ বছর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে এসব অপরাধে ১০ বছর পর্যন্ত কারদন্ডের বিধান রয়েছে।

জনগণের জান ও মালের নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্র ও সরকারের উপর অর্পিত। তাই রাষ্ট্রের কোনো নাগরিক যদি অন্য কোনো নাগরিকের সঙ্গে বস্তু, সম্পদ বা যে কোনো বিষয় নিয়ে ধোঁকা

বা প্রতারণার আশ্রয় নেয় তবে ওই ব্যক্তির শান্তি, নিরাপত্তা ও সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে এ দুইটি ধারায় শাস্তি ও জরিমানার বিধান রেখেছে রাষ্ট্র।

প্রতারক বা ধোঁকা দেয়া ব্যক্তিকে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করে থাকে। সে কারণেই দুনিয়ার সব দেশেই ধোঁকা বা প্রতারণা ঠেকাতে জেল-জরিমানাসহ কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে।

মনে রাখতে হবে:

ধোঁকা বা প্রতরণার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ দিয়ে দান-সহযোগিতা, ধর্মীয় কাজ কুরবানি, মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ, জনসাধারণের জন্য রাস্তাঘাট-কালভার্ট নির্মাণ কোনোটিই বৈধ নয়। আর এতে সাওয়াবও মিলবে না।

কেননা দান-সহযোগিতা, সমাজ সংস্কারসহ জনকল্যাণমূলক কাজ কোনো ব্যক্তির জন্য আবশ্যক নয় বরং তা মোস্তাহাব বা নেকির কাজ। আর ইসলামে ধোঁকা ও প্রতারণা হারাম ও নিষিদ্ধ কাজ।

সে কারণে ধোঁকা ও প্রতারণায় অর্জিত সম্পদ ধর্মীয় যে কোনো কাজে ব্যবহারের যেমন কোনো নিয়ম নেই তেমনি দুনিয়ার কল্যাণমূলক কোনো কাজেও তা ব্যবহার যোগ্য নয়। আর তাতে সাওয়াব লাভেরও কোনো সুযোগ নেই।

হারাম কাজের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ দিয়ে মোস্তাহাব বা নেকির কাজের দিকে ধাবিত হওয়া কোনো মুমিন মুসলমানের কাজ হতে পারে না। বরং ধোঁকা ও প্রতারণার সব কাজ থেকে নিজেদের বিরত রাখা সাওয়াব ও নেকির কাজ।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে ধোঁকা বা প্রতারণার মতো জঘন্য নিষিদ্ধ ও দুনিয়ার শাস্তিযোগ্য কাজ থেকে বিরত থাকার তাওফিক দান করুন। হাদিসের নির্দেশনা মোতাবেক ধোঁকা ও প্রতারণামুক্ত থেকে প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দলভূক্ত থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন।

স্বর্নের বার নামক ফাঁদঃ গরীব কাজের মহিলা বা রিক্সা ওয়ালা সেজে প্রতারণা করে লাখো টাকা হাতিয়ে নেয় অনেক চক্র। লোভ দেখায় লাখ টাকার স্বর্নী বার বা স্বর্নের গহনা বিক্রি করে দিবে মাত্র ৫/১০ হাজার টাকার বিনিময়ে।

সাম্প্রতিক এক নিউজে পাওয়া রিপোর্ট সেয়ার করলাম নিচে–

বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে নকল সোনার বার, নকল ম্যাগনেটিক পিলার ও কয়েন এবং ভুয়া কাস্টমস্ কর্মকর্তা পরিচয়ধারী প্রতারক চক্রের মূলহোতাসহ ১০ জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) এর গোয়েন্দা ওয়ারী বিভাগ।

গ্রেফতারকৃতরা হলো মোঃ বশার মোল্লা, শেখ সোহাগ হোসেন মিন্টু, দ্বীন মোহাম্মদ, মোঃ জুয়েল শিকদার, কথিত ড. মোজাম্মেল খান ওরফে আকাশ, শেখ আলী আকবর, মোঃ জামাল ফারাজী, মোঃ সোহেল শিকদার, মোঃ বিল্লাল হোসেন ও মোঃ শাহরিয়ার ইকবাল।

প্রতারক চক্রের সদস্যরা একেক জন একেক চরিত্রে অভিনয় করতো। ম্যাগনেটিক পিলার, কয়েন ও সোনারবার সরবরাহ করার কথা বলে সুকৌশলে সাধারণ মানুষের সাথে প্রতারণা করে ১১ কোটি টাকা আত্বসাৎ করেছে এ প্রতারক চক্র।

রবিবার (২৩ অক্টোবর ২০২২) রাজধানীর বিমানবন্দর ও দক্ষিণখান থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করে গোয়েন্দা ওয়ারী বিভাগের সংঘবদ্ধ অপরাধ ও গাড়িচুরি প্রতিরোধ টিম।



এ সময় তাদের হেফাজত থেকে নকল ৪টি সোনার বার, সোনার বার তৈরীর মেশিন, তামার তার, তার গলানোর ক্যামিক্যাল, হিউম্যান রাইটসের নকল আইডি কার্ড এবং সিভিল এভিয়েশনের নকল আইডি কার্ড উদ্ধার করা হয়।

আজ সোমবার (২৪ অক্টোবর ২০২২) বেলা ১১:৩০ টায় ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে উপস্থিত সাংবাদিকদের সামনে এ বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন ডিএমপির যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (এ্যাডমিন এন্ড ডিবি দক্ষিণ) সঞ্জিত কুমার রায়, বিপিএম-সেবা।

ডিবির যুগ্ম পুলিশ কমিশনার বলেন, ভাটারা থানার একটি প্রতারণা মামলার তদন্তে একজন মহিলা ভিকটিমের সন্ধান পাওয়া যায়। যিনি গ্রেফতারকৃত প্রতারক চক্রের ফাঁদে পড়ে দুটি ফ্ল্যাট বিক্রি করে সমুদয় টাকা প্রতারকদের হাতে তুলে দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন। ভাটারা থানা এই মামলাসহ বিমানবন্দর থানার অপর একটি প্রতারণার মামলা তদন্তকালে এজাহারনামীয় আসামী ও প্রতারক চক্রের মূলহোতাসহ ১০ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

তিনি বলেন, গ্রেফতারকৃত মোঃ বশার মোল্লা নিজেকে কাস্টমস ডাইরেক্টরের এপিএস হিসাবে পরিচয় দিয়ে কম দামে স্বর্ণের বার ক্রয় করে দেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করে। গ্রেফতারকৃত শেখ সোহাগ হোসেন মিন্টু নিজেকে কাস্টমস ডাইরেক্টর এ্যাডমিন হিসাবে ক্রেতার সাথে দেখা করে বিশ্বস্ততা অর্জন করে। গ্রেফতারকৃত দ্বীন মোহাম্মদ ও মোঃ জুয়েল শিকদার স্বর্ণকার হিসাবে নকল সোনারবার তৈরী করে। গ্রেফতারকৃত কথিত ড. মোজাম্মেল খান ওরফে আকাশ নিজেকে কেমিস্ট ও পরমাণু বিশেষজ্ঞ পরিচয় দেয়। গ্রেফতারকৃত শেখ আলী আকবর নিজেকে অবসরপ্রাপ্ত মেজর হিসাবে পরিচয় দেয়। গ্রেফতারকৃত মোঃ জামাল ফারাজী, মোঃ সোহেল শিকদার, মোঃ বিল্লাল হোসেন এবং মোঃ শাহরিয়ার ইকবাল ক্রেতা যোগাড় করে কথিত পরমাণু বিজ্ঞানীর কাছে নিয়ে যেতো। পরবর্তীতে তারা ম্যাগনেটিক পিলার, কয়েন ও সোনারবার পরীক্ষা করে সঠিক আছে মর্মে ভুয়া রির্পোট দিতো।

গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে কলাবাগান থানা, দক্ষিণখান থানা, উত্তরা-পূর্ব থানা, কাশিমপুর থানা ও বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট থানায় একাধিক মামলা রয়েছে মর্মে জানান গোয়েন্দা পুলিশের এ কর্মকর্তা।

কেউ যদি কখনো সোনার বার, ম্যাগনেটিক পিলার কিংবা মূল্যবান কয়েন বিক্রির প্রস্তাব দেয় তাহলে সে প্রস্তাবে রাজি না হয়ে গোয়েন্দা পুলিশকে অবগত করার আহবান জানান পুলিশের এ কর্মকর্তা।

গোয়েন্দা ওয়ারী বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ আশরাফ হোসেন, পিপিএম এর সার্বিক দিকনির্দেশনায় অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার মোঃ তরিকুর রহমান এর তত্বাবধানে সংঘবদ্ধ অপরাধ ও গাড়িচুরি প্রতিরোধ টিমের পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) মোঃ আরজুন এর নেতৃত্বে অভিযানটি পরিচালিত হয়।

অনলাইনে স্বর্ণের ব্যবসার নামে যেভাবে প্রতারণা করতেন তারা ঈদকে সামনে রেখে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে প্রতারক চক্র। ফেসবুকে পেইজ খুলে মাত্র ৪৭ হাজার টাকায় এক ভরি স্বর্ণ বিক্রির বাহারি বিজ্ঞাপন, অর্ডার নিশ্চিত হলে ভুয়া ডেলিভারি স্লিপ পাঠিয়ে অর্ধেক মূল্য হাতিয়ে নিয়ে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়া। এভাবেই কয়েক লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন তিন শতাধিক মানুষের কাছ থেকে।

সিলেটে এক নারী চিকিৎসকের অভিযোগের ভিত্তিতে রোববার মূল হোতা এক তরুণীসহ এই প্রতারক চক্রের ৫ জনকে চট্টগ্রাম থেকে আটক করেছে র‍্যাব-৯।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন– আয়েশা সিদ্দিকা (২০), তার স্বামী আব্দুল আল মোমেন ওরফে বাক্কার (২৬), মো. ওসমান গনি সরোয়ার (২৩), মো. বাবর আলী শেখ (২৫) এবং মো. মেহেদী হাসান (১৭)। তাদের কাছ থেকে প্রতারণার কাজে ব্যবহৃত ৬টি মোবাইল ফোন এবং ৭টি সিম উদ্ধার করা হয়।

র‍্যাব–৯ এর অধিনায়ক উইং কমান্ডার মো. মোমিনুল হক জানান, ৪ অভিযোগকারীর অভিযোগ এবং গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদে স্বর্ণ বিক্রির ভুয়া অনলাইন পেইজ 'চারু নিকেতন' ব্যবহার করে প্রতারক চক্রের বিশাল প্রতারণা কার্যক্রম সম্পর্কে জানা যায়। আয়েশা সিদ্দিকা হচ্ছেন এই পেইজের এডমিন এবং বাকি আসামিরা সহযোগী। এছাড়াও অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিরা এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

তিনি বলেন, আয়েশা সিদ্দিকা মূলত অন্য একটি অনলাইন পেইজের মাধ্যমে কাপড় বিক্রি করতেন। ছয় মাস আগে তিনি প্রতারণার উদ্দেশ্যে ফেসবুকে চারু নিকেতন নামক স্বর্ণ বিক্রির পেইজ খুলেন। তার এই পেইজের বর্তমান ফলোয়ার্সের সংখ্যা সাত হাজারের অধিক। কম দামে এবং কিস্তিতে আকর্ষণীয় ডিজাইনের স্বর্ণের গহনার পোস্ট দিয়ে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। ক্রেতারা পেইজে যোগাযোগ করে বিস্তারিত জানতে চাইলে বলা হতো গহনা কিনতে হলে অ্যাডভানস হিসেবে অর্ধেক মূল্য বিকাশ করতে হবে। বিকাশ করা সম্পন্ন হলেই এই প্রতারকরা নিতো আরেক প্রতারণার আশ্রয়। ভুয়া কুরিয়ার স্লিপের ছবি পাঠানো হতো ক্রেতাদের মেসেঞ্জারে। এরপর ও যখন দেরি হতো তখন এই প্রতারক চক্র আরও টাকা হাতিয়ে নেয়ার জন্য টালবাহানা করত। অবশেষে ভুক্তভোগী ক্রেতাকে ম্যাসেঞ্জারে এবং ফেসবুকে ব্লক করে দিত এই প্রতারক চক্র।

মো. মোমিনুল হক জানান, সরল বিশ্বাসে এবং লোভের বশবর্তী হয়ে প্রতারণার ফাঁদে পা দেয়া এ পর্যন্ত ২৫০ থেকে ৩০০ ব্যক্তির নিকট থেকে ২৫ থেকে ৩০ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে এই চক্রটি।

তিনি আরও জানান, 'চারু নিকেতন' নামক একটি জুয়েলারি শপ এর প্রকৃত অবস্থান মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল থানা এলাকায়। এই জুয়েলারি শপ এর মালিকের সঙ্গেও কথা বলেছে র‍্যাব। অনলাইনে স্বর্ণ বিক্রির কোনো ফেসবুক পেজ চালান না এবং প্রতারিত হওয়া অনেক ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ তার কাছে অভিযোগ করলে তিনি সংশ্লিষ্ট থানায় এ নিয়ে অভিযোগও করেছেন।

এই কর্মকর্তা জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতার ব্যক্তিরা তাদের অপরাধ স্বীকার করেছেন। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ভুক্তভোগী ডা. নিষ্ঠা চক্রবর্তী কর্তৃক দায়েরকৃত এসএমপির জালালাবাদ থানার মামলায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এই প্রতারক চক্রের সঙ্গে জড়িত অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের গ্রেফতারের লক্ষ্যে র‍্যাব–৯ এর অভিযান অব্যাহত আছে।

র‍্যাব–৯ এর কার্যালয়ে অভিযোগকারী সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডা. নিষ্ঠা চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা হয় যুগান্তরের। তিনি জানান, তিনি এক ভরি স্বর্ণ অর্ডার করেছিলেন। আয়েশা সিদ্দিকা তাকে ডেলিভারির জন্য কুরিয়ারে পাঠানো হয়েছে এমন একটি স্লিপ তার ফেইসবুক মেসেঞ্জারে পাঠান। তার পর অর্ধেক মূল্য পরিশোধ করার জন্য বলা হয়। তিনি ২৫ হাজার টাকা বিকাশে পাঠানোর পর থেকেই তাকে ফেসবুক পেইজ থেকে ব্লক করে দেয়া হয়। তাদের সঙ্গে কোনোভাবেই তিনি আর যোগাযোগ করতে পারেননি। অবশেষে সিলেটের জালালাবাদ থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন পাশাপাশি র‍্যাবের কাছে অভিযোগ দেন।

তিনি বলেন, শুধু তার ২৫ হাজার টাকা ফিরে পাওয়ার জন্য নয়; তারা যেন আর কারো সঙ্গে প্রতারণা করতে না পারে সেই উদ্দেশ্যেই তিনি র‍্যাবের কাছে অভিযোগ করেছেন।

এ সময় র‍্যাব কার্যালয়ে গ্রেফতারকৃত প্রতারক চক্রের মূল হোতা আয়েশা সিদ্দিকার সঙ্গে কথা বললে তিনি এসব অভিযোগ স্বীকার করেন। বলেন, এ পর্যন্ত ৩ শতাধিক মানুষকে তারা তাদের প্রতারণার জালে ফেলেছেন।(যুগান্তর,২১ মে ২০২২)

চাকরির নামে প্রতারণা

বিভিন্ন কৌশলে ফাঁদে ফেলে তরুণদের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে প্রতারক চক্র * চাকরিপ্রার্থীদের আরও সচেতন হওয়ার প্রয়েজন।



দেশে যে হারে শিক্ষিত বাড়ছে, সে হারে কর্মক্ষেত্র বাড়ছে না। ফলে অনেকেই বেকার থেকে যাচ্ছে। চাকরি যেন 'সোনার হরিণ' হয়ে দাঁড়িয়েছে। বুকভরা স্বপ্ন নিয়ে পড়ালেখা শেষ হলেও জুটছে না কাঙ্ক্ষিত চাকরি।

শিক্ষিত বেকাররা নিজ জেলায় ব্যর্থ হয়ে চাকরির সন্ধানে ভিড় করছেন রাজধানীতে। এ সুযোগে এক শ্রেণীর প্রতারক চাকরি নামে প্রতারণার ফাঁদ পেতে বসে আছে। এই ফাঁদে পড়ে অনেকেই প্রতারিত হচ্ছেন। এতে অনেকে চাকরি পাওয়ার আসায় উপরি দিতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। কিন্তু মিলছে না কাঙ্ক্ষিত সোনার হরিণটি।

বিশেষ করে ব্যাংক, বীমা, এমএলএম কোম্পানি, বিপণন কোম্পানি, মার্কেটিং কোম্পানির নামে বেশি প্রতারণা করা হচ্ছে। রাজধানীর বিভিন্ন বাসে, জনসমাগম হয় এমন স্থানে চাকরির আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। এতে পার্ট টাইম চাকরির নামে ছাত্রছাত্রীদের প্রতারণার ফাঁদে ফেলা হয়। নিয়োগের নামে তাদের কাছ থেকে জামানত বা অন্যান্য খাতের অর্থ নিয়ে সটকে পড়ে। এসব বিষয়কে বেকারদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

এদিকে ভুয়া এমএলএম কোম্পানির নামে প্রতারণার ঘটনায় গত বছরের এপ্রিলে ২৩ জনকে গ্রেফতার করেছে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন র‌্যাব-১১। তখন প্রতারকদের অবৈধ মালামালসহ উদ্ধার করা হয়েছিল ৩১ জন ভিকটিমকেও। একটি ভুয়া এমএলএম কোম্পানি মাসিক ১৬ হাজার ও এর বেশি টাকা বেতনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনটি ভিন্ন প্যাকেজে চাকরি প্রত্যাশীদের কাছ থেকে যথাক্রমে ২৭ হাজার ১০০, ৩৭ হাজার ১০০ ও ৪৭ হাজার ১০০ টাকা গ্রহণ করে।

পরবর্তী সময়ে প্রশিক্ষণের নামে সপ্তাহখানেক কালক্ষেপণ করে প্রত্যেককে নতুন দুজন সদস্য সংগ্রহের শর্ত দেয়। নতুন সদস্য সংগ্রহ করে দিলে সংগৃহীত টাকার সামান্য কমিশন প্রদান করে। নতুন সদস্য দিতে না পারলে কৌশলের আশ্রয় নিয়ে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে খালি স্ট্যাম্প ও আপসনামায় জোর করে স্বাক্ষর নিয়ে তাড়িয়ে দেয়। প্রতিবাদ করলে ভাড়াটিয়া লোকজন দিয়ে আটকে রেখে শারীরিক নির্যাতনও করে।

জানতে চাইলে র‌্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সারোয়ার আলম যুগান্তরকে বলেন, কারো কাছে এমন কোনো অভিযোগ পেলেই আমরা অভিযান চালাই। আর এর আগেও বিভিন্ন সময় অভিযান চালিয়ে প্রতারকদের আইনের আওতায় আনা হয়েছে। যারা এসব চাকরির প্রলোভন দেখায় এবং যারা চাকরি প্রার্থী তাদের সচেতন হতে হবে।

অন্যদিকে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে নিরীহ লোকদের কাছ থেকে প্রতারণার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ টাকা আত্মসাৎ করে এক সংঘবদ্ধ প্রতারক চক্র। এ চক্রের একটি অংশ রাজধানীতে উইনেক্স ট্রেড কর্পোরেশন লিমিটেড নামে একটি অফিস খুলে চাকরি দেয়ার নামে প্রতারণা করছে। বিভিন্ন জেলার শিক্ষিত ও বেকার যুবকদের চাকরি দেয়ার প্রলোভন দিয়ে ও চাকরির জামানত বাবদ মোট অঙ্কের টাকা রেখে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নেয় প্রতারকরা।

তাদের ফাঁদে ফেলার পর নিজেদের আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবদেরকে প্রলোভন দেখিয়ে কীভাবে এই কোম্পানিতে আনতে হবে সেই সম্পর্কে ট্রেনিং দেয়া হতো। পরবর্তী সময় অসহায় যুবকরা কোম্পানির উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে ওই প্রতিষ্ঠানে চাকরি করবে না মর্মে টাকা ফেরত চেয়ে আবেদন করে। পরে কোম্পানি তাদেরকে ঘোরাতে থাকে। আর যারা নতুন সদস্য সংগ্রহ করতে না পারত তাদেরকে ভয়ভীতি দেখিয়ে বিদায় করে দেয়া হতো।

পরে ভুক্তভোগীদের অভিযোগের ভিত্তিতে গত বছরের আগস্ট মাসে মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের সিরিয়াস ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ইউনিটের রোবারি প্রিভেনশন টিম বারিধারার উইনেক্স ট্রেড কর্পোরেশন লিমিটেড কথিত অফিসে অভিযান চালায়। পরে সেখান থেকে ১৬ প্রতারককে আটক করে। গত তিন বছরে ওই প্রতিষ্ঠানটি কয়েক হাজার যুবককে প্রতারিত করে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। যার প্রমাণ ওই অফিসে পাওয়া গেছে।

এ ছাড়া ২০১৪ সালে পটুয়াখালীর কলাপাড়ার তৃতীয় সমুদ্রবন্দরে চাকরি দেয়ার নাম করে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয় একটি চক্র। জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে এ প্রতারণা করা হয়। ১৬ যুবক নিয়োগপত্র পেয়ে চাকরিতে যোগ দিতে গিয়ে দেখে, গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়াই ভুয়া। এভাবে দেশের ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের সুযোগ নিচ্ছে কয়েকটি প্রতারক চক্র। কখনও বিদেশে পাঠানোর নামে, কখনও দেশে চাকরি দেয়ার নামে, কখনও ব্যবসায় মুনাফা লাভের নামে এসব চক্র বিপুল অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। এর আগে দেশে আইটিসিএল, ডেসটিনি, যুবক, ইউনিপে-টু হাতিয়ে নিয়েছে হাজার হাজার কোটি টাকা

অন্যদিকে ২০১৫ সালের ২৫ জুন পদ্মা সেতু প্রকল্পে চাকরি দেয়ার নামে এক প্রতারক চক্র ধরা পড়ে। র‌্যাব-১ রাজধানী সবুজবাগ ও আদাবর এলাকায় সাঁড়াশি অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে। প্রতারকরা ছিল আবদুল খালেক, শফিকুল আলম ও খলিলুর রহমান নয়ন। তারা একটি কোম্পানির নামে ভুয়া নিয়োগপত্র দিয়ে বেকার যুবকদের কাছ থেকে কয়েক কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়। চায়না মেজর ব্রিজ সিকিউরিটি সার্ভিস নামের একটি কোম্পানির পরিচয়ে এই চক্রটি ১৪০০ চাকরি প্রত্যাশীর কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা করে ৭ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়। আকর্ষণীয় বেতন-ভাতায় এদের ভুয়া নিয়োগপত্র দেয়ার পর তারা যখন চাকরিতে যোগ দিতে যায় তখনই তারা বুঝতে পারে তারা প্রতারণার শিকার। অনন্যোপায় হয়ে প্রতারিতরা বিভিন্ন থানা ও র‌্যাবকে জানায়। র‌্যাব ওই দিন সন্ধ্যায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে। পরে তারা প্রতারণায় জড়িত থাকার বিষয়টি স্বীকার করে।

এদিকে প্রতারকরা চোখের সামনেই এসব চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়ে যাচ্ছে। কখনও প্রতিষ্ঠিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায়। আবার কখনও গণপরিবহনে এ সব বিজ্ঞাপন দেখা যাচ্ছে। সেখানে লেখা আছে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পার্ট টাইম জব। দিনে তিন ঘন্টা। আর সপ্তাহে চারদিন। বেতন সাত থেকে দশ হাজার টাকা। এমন বিজ্ঞাপন দেখে অনেক শিক্ষার্থী পা বাড়িয়ে নিজেদের সর্বস্ব হারিয়েছেন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মো. জসিম উদ্দিন যুগান্তরকে বলেন, ২০১৪ সালে ইন্টার পরীক্ষার রেজাল্ট হওয়ার পর গ্রাম থেকে রাজধানীতে আসি অনার্স পড়ার জন্য। কিন্তু পরিবারের আর্থিক অবস্থা তেমন একটা সচ্ছল ছিল না। তাই ঢাকায় থাকতে ও পড়তে নিজে খরচের ব্যবস্থা করতে একটি পার্ট টাইম চাকরি খুঁজতে লাগলাম। একদিন বাসে করে এক বন্ধুর বাসায় যাচ্ছিলাম।

সেখানে দেখি সপ্তাহে তিন দিন ও দিনে চার ঘন্টা কাজে ১২ হাজার টাকা দেবে বলে একটি বিজ্ঞাপন দেয়। সঙ্গে পাঁচ হাজার টাকা জামানত দেয়ার কথাও বলা হয়। তিনি বলেন, অফিসটি ছিল মালিবাগে। বিজ্ঞাপনে থাকা ঠিকানায় যোগাযোগ করলে চাকরিটা কনফার্ম করে।

কিন্তু কি কাজ করতে হবে জানতে চাইলে তা বলে না। তবে আমি চিন্তা করলাম মাসে ১২ হাজার টাকা পাব, থাকা-খাওয়া ও পড়ালেখা ভালো চালিয়ে নিতে পারব বলে পাঁচ হাজার টাকা ম্যানেজ করে তাদের দেই। এমন আমার মতো আরও ৩০-৪০ জন টাকা দেন। আমাদের ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসের এক তারিখে অফিসে জয়েন্ট করার কথা বলে। আমরা সেভাবে যাই। কিন্তু অফিসে গিয়ে দেখি তালা ঝুলানো। আর বাইরেও কেউ নেই। ততক্ষণে সবাই বুঝতে পারলাম আমরা প্রতারণার শিকার হয়েছি।

বিদেশ পাঠানোর নামে প্রতারনাঃ রাস্তায় কিংবা বাসে প্রায় সময় ই দেখা যায় নানা চটকদার বিজ্ঞাপন। যেখানে দেখানো হয় নানা প্রলোভন। কিভাবে সহজেই বিদেশ গিয়ে ভাগ্য পরিবর্তন করা সম্ভব। সল্প আয়ের মানুষ জন ভাগ্যের চাকা ঘুরানোর উদ্দেশ্যে পারিজমাতে চায় স্বপ্নের দেশে। প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান দিতে কখনো কখনো বিক্রি করে দেয় বসতভিটা বা শেষ সম্বল টুকুও। কিন্তু অধিকাংশ ই স্বীকার হচ্ছে নানা প্রতারনার।

কখনো আবার জীবন ও দিতে হচ্ছে এই প্রতারক চক্রের হাতে।



সাম্প্রতিক এক পত্রিকা থেকে নেয়া ঘটনাঃ

ঘটনা ১-বিদেশে পাঠানোর নামে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া দুই প্রতারককে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব। তারা হলেন চক্রের মূলহোতা মাহবুব উল হাসান (৫০) ও তার প্রধান সহযোগী মাহমুদ করিম (৩৬)। রাজধানীর শান্তিনগর থেকে র‍্যাব-৩ এর একটি দল বৃহস্পতিবার রাতে চক্রের এ দুজনকে গ্রেফতার করে।

তাদের কাছ থেকে জব্দ করা হয় বিপুলসংখ্যক পাসপোর্ট, ভুয়া ভিসা ও জাল কাগজপত্র। তারা বিদেশে কর্মী পাঠানোর নামে তিন কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। র‍্যাব জানায়, এ চক্রটি ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে উচ্চ বেতনে চাকরি দেওয়ার মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে নিরীহ ও বেকার যুবকদের কাছ থেকে প্রতারণার মাধ্যমে টাকা হাতিয়ে নিয়েছে।

শুক্রবার কাওরান বাজারে র‍্যাব মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে র‍্যাব-৩ এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আরিফ মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, ভিকটিমদের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে র‍্যাব-৩ বৃহস্পতিবার রাজধানীর শান্তিনগর এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযানকালে মাহবুব ও মাহমুদকে

গ্রেফতার করা হয়। তাদের কাছ থেকে ৫২১টি পাসপোর্ট, বিদেশে চাকরির জন্য তৈরি করা ভুয়া কোর্সের ৬৫টি সনদ, ৩০০টি মেডিকেল সার্টিফিকেটসহ অন্যান্য উপকরণ জব্দ করা হয়।

গ্রেফতররা বিভিন্ন অসহায় দরিদ্র লোকের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, তারা বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে দালালের মাধ্যমে ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে যেতে ইচ্ছুক লোকজনের পাসপোর্ট সংগ্রহ করে। এভাবে তারা গত দুই বছরে ৫২১টি পাসপোর্ট সংগ্রহ করেছে। এর মধ্যে যারা মধ্যপ্রাচ্যে যেতে ইচ্ছুক তাদের কাছ থেকে দুই থেকে তিন লাখ এবং যারা ইউরোপে যেতে ইচ্ছুক তাদের কাছ থেকে ছয় থেকে সাত লাখ টাকা করে জমা নেয়। আরও বলেন, মাহবুব ২০০০ সাল থেকে সংঘবদ্ধ মানব পাচার ও প্রতারক চক্রের সদস্য।

বিদেশে উচ্চ বেতনের চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে প্রতারণার মাধ্যমে কিছু লোক পাঠায়। বিদেশে পৌঁছার পর বিদেশে অবস্থানরত এজেন্ট দিয়ে পুনরায় প্রতারণা করা হয়। তাদের কাজের নামে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে বন্দি করে রাখা হয়। সেখানে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয়। এক সময়ে ভিকটিমদের কোনো খাবার দেওয়া হয় না। এ সময়ে মাহবুবের সঙ্গে যোগাযোগ করলে সে ভিকটিমদের অপেক্ষা করতে বলে। সে জানায়, কিছুদিন পরে কোম্পানি চালু হবে। তখন তারা বেতন ও কাজের সুযোগ পাবেন।

এর মধ্যে বিদেশে অবস্থানরতরা নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে অনেকে নিজেদের চেষ্টায় টিকেট জোগাড় করে দেশে আসার চেষ্টা করেন। এরপর ভিকটিম দেশে ফিরে এলে মাহবুব অভিভাবক এবং ভিকটিমদের উলটো দোষারোপ করে। সে দাবি করে, ভিকটিম আরও কিছুদিন অপেক্ষা করলে কাজের সুযোগ পেত। এভাবে করোনা মহামারির পূর্ব পর্যন্ত মালয়েশিয়া, দুবাই এবং সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ভিকটিমদের পাঠিয়ে প্রতারিত করে তাদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা হাতিয়ে নিয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে র‍্যাব-৩ এর অধিনায়ক জানান, আসামিদের ট্রাভেল এজেন্সি বা রিক্রুটিং এজেন্সি পরিচালনার কোনো লাইসেন্স নেই। স্বল্প সময়ে, বিনাশ্রমে অধিক লাভ বা অর্থ উপার্জনই তাদের একমাত্র লক্ষ্য।

ব্রিফিংয়ের সময় র‍্যাবের মিডিয়া সেন্টারে আসেন বেশ কয়েকজন ভুক্তভোগী। ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে পাঠানার নামে তাদের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। একজন ভুক্তভোগী যুগান্তরকে বলেন, যারা তাদের কাছে রোমানিয়ার জন্য টাকা জমা দিয়েছে তাদের কারও ভিসাই ঠিক নেই। সবাই প্রতারিত হয়েছে।

আরেকজন বলেন, পাসপোর্টের সঙ্গে সব টাকা দেওয়ার দেড় মাস পর মাহবুব উল হাসান তাকে একটা পারমিট দেয়। পারমিটটাও ছিল ভুয়া। আরেকজন জানান, তিনি তার বিয়াইকে রোমানিয়া পাঠানোর জন্য টাকা দিয়েছিলেন। তাকে একটি ভুয়া ওয়ার্ক পারমিট দেয়। ভুক্তভোগিরা জানিয়েছেন, তাদেরকে ভিজিট ভিসায় দুবাই পাঠিয়ে দেয়া হতো।

ঘটনা ২- বিভিন্ন দেশে উচ্চ বেতনে চাকুরী দেওয়ার কথা বলে জাল ভিসা দিতো তারা। ভুক্তভোগীরা সব টাকা পরিশোষ করার পরও জাল ভিসার কারণে শেষ পর্যন্ত কাঙ্খিত দেশে যেতে পারতেন না। জাল ভিসাকে বৈধ ভিসা হিসেবে দেখিয়ে ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে চুক্তি অনুযায়ী টাকা নেওয়ার পর প্রতারক চক্রটি আত্মগোপনে চলে যেতেন। এভাবে দীর্ঘদিন ধরে প্রতারনার মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিতেন চক্র।

জাল ভিসায় বিদেশে লোক পাঠানোর মধ্যেমে জালিয়াতীর অভিযোগে করা একটি মামলায় ৬ জনকে গ্রেপ্তারের পর এমন তথ্য পেয়েছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ ও অপরাধ তথ্য বিভাগ (ডিবি)। ডিবির গুলশান বিভাগের ক্যান্টনম্যান্ট জোলাল টিমের নেতৃত্বে এ অভিযান চালানো হয়। গ্রেপ্তার করা হয়। মোঃ জুয়েল প্রধান (৩৮),মোঃ মোকছেদুর রহমান রাজ(৪০), মোঃ লিটন মাহমুদ (৪০), মোঃ ফুল মিয়া (৫২), মোঃ আরিফ হোসেন (৫০), এবং মোঃ আব্দুল কাদের সোহাগ (৪৩) কে। এ সময় তাদের কাছ থেবে জাল ভিসা ও ভিসা তৈরীর সরঞ্জাম উদ্ধার। এর আগে আসামীদের বিরুদ্ধে বিমানবন্দর থানায় মামলা করেন মো: নাদিম নামের এক ব্যক্তি।

ডিবির এডিসি কামরুজ্জামান সরদার জানান, মামলার বাদী মোঃ নাদিমের স্ত্রীর সাথে বিবাদী জুয়েল প্রধানের সাথে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ইমু অ্যাপসে পরিচয় হয়। সেই থেকে বাদীর সাথেও পরিচয় হয়। কোন এক পর্যায়ে বাদীকে জুয়েল প্রধান জানায়, "তারা বিদেশে লোক পাঠায়"। সেই সুবাধে বাদীকে কানাডা বা ইতালিতে পাঠানোর প্রস্তাব দেয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে বাদী প্রতারক চক্রের সদস্যদের গত ২০২১ সালের ১০ মে থেকে বিভিন্ন সময়ে ৭ লক্ষ টাকা প্রদান করে।

ডিবি জানিয়েছে, টাকা প্রদানের কিছুদিন পর তারা বাদীকে একটি কানাডিয়ান ভিসা দেয়। বাদী অনলাইনে চেক করে উক্ত ভিসাটি সঠিক নয়, এটি জাল ভিসা। পরবর্তীতে বাদী ৭ লাখ টাকা ফেরত চাইলে জুয়েল প্রধানসহ অন্যরা বাদীকে ইতালিয়ান ভিসা প্রদান করবে বলে জানায়। সে মোতাবেক বাদীকে প্রতারক চক্রের সদস্যরা পরস্পর যোগসাজসে গত চলতি বছরের ১৮ জুন একটি ইতালিয়ান জাল ভিসা করিয়ে দেয়। পাশাপাশি ২২ জুন তারিখে ফ্লাইটের একটি টিকেট প্রদান করে। ডিবি জানিয়েছে, বাদী ওই ভিসা ও টিকেট নিয়ে গত ২২ জুন ইতালিতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ঢাকা বিমানবন্দরে যায়। বিমানবন্দরে যাওয়ার পর অজ্ঞাত লোক বাদীকে মোবাইলে ফোন করে বলে যে, এয়াপোর্টের ভিতরে তুমি সোনালী ব্যাংকের পাশে বসে থাক। কিছুক্ষণ পর ওই একই নম্বরের ফোন দিয়ে বলে যে, ৭নং কাউন্টার সিঙ্গাপুর এয়ার লাইন্সে যাও। তখন বাদী রাত সাড়ে ৮ টায় সিঙ্গাপুর এয়ার লাইন্সে যায়, সেখানে কর্তব্যরত একজন মহিলাকে তার পাসপোর্ট ও টিকিট দেয়। তিনি বাদীর পাসপোর্ট ও টিকিট দেখে সন্দেহ হওয়ায় তিনি তার পাশের অন্য কর্মকর্তাকে দেখালে তারা দেখে বাদীকে জানান যে, এটি একটি জাল ও ভূয়া ভিসা। পরবর্তীতে বাদী এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়ে আসে এবং বিষয়টি নিয়ে তার আত্মীয় স্বজনের সাথে পরামর্শক্রমে এয়ারপোর্ট থানায় বর্ণিত বিষয়ে অভিযোগ করলে সূত্রে বর্ণিত মামলা রুজু হয়।

ডিবি জানিয়েছে, মামলার সূত্র ধরে তদন্তে নামে ডিবির ক্যান্টম্যান্ট জোলনাল টিম। টিমের লিডার এডিসি এস এম রেজাউল হক অভিযান চালিয়ে শাহআলী থানা থেকে থেকে লিটন মাহমুদকে গ্রেপ্তার করে। পরে তার দেয়া তথ্যে অন্যান্যদের গ্রেপ্তার করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা সূত্রে বর্ণিত মামলার ঘটনার বিষয়ে জাড়িত থাকার কথা স্বীকার করে। আসামীরা একটি সংঘবদ্ধ ভিসা জাল-জালিয়াতি প্রতারক দলের সক্রিয় সদস্য। তারা পরস্পর যোগসাজসে দীর্ঘ দিন যাবৎ দেশের প্রত্যান্ত অঞ্চলের বিদেশগামী লোকজনের নিকট হতে টাকা-পয়সা নিয়ে জাল ভিসা প্রদান করে প্রতারণা করে

আসছে মর্মে তথ্য পাওয়া যায়। আসামীদের নিকট হতে জাল ভিসা ও ভিসা তৈরীর সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।

পণ্যে ভেজাল প্রদান ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ:

বর্তমান বাজারে এমন হয়তো একটি পন্য ও পাওয়া যাবে না যাতে ভেজাল মিশ্রণ করা হয়নি। কৃষি মাঠ থেকে শুরু করে বাজার পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে পন্যে ভেজাল দেয়া হয়। কখনো কীটনাশক, কখনো বা ফরমালিন। নাম যাই হোক কাজ কিন্তু তার ভয়াবহ। এই রাসায়নিক পদার্থ গুলো ও কিন্তু প্রযুক্তির দান। যার খেসারত দিতে হচ্ছে মানুষকে। কখনো তা আসলে ক্যান্সার রুপে আবার কখনো তা আসছে ফুডপয়জনের রুপে। এছাড়াও আছে নানা চর্ম রোগ।



অথচ ইসলামে খাদ্যদ্রব্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যে ভেজাল প্রদান করা হারাম। ১৯৬০ সালে উপমহাদেশের প্রাচীনতম দৈনিক 'আজাদ'-এর 'হুশিয়ারী' শীর্ষক এক সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিল, 'খাদ্যে ভেজাল মিশান শুধু অপরাধই নহে, ইহা পাপ বলিয়াও আমাদের মনে হয়। বাহিরের দুশমন অপেক্ষাও খাদ্যে ভেজাল দানকারীরা দেশ ও জাতির অনেক বড় দুশমন। ইহাদের কাজের ফলে ধীরে ধীরে বিষ প্রয়োগের মত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং জাতি ক্রমে জীবনী শক্তিহীন হইয়া উঠিতে থাকে'।একজন খুনী গুলী করে কাউকে হত্যা করলে একজন ব্যক্তিই নিহত হয়। কিন্তু খাদ্যে ভেজাল কোটি কোটি মানুষকে অকাল মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। শিশুখাদ্যে ভেজাল সর্বনাশ করে গোটা একটা প্রজন্মের শরীর, জীবনীশক্তি, মেধা ও আয়ুর। স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞরা বলেন, ভেজাল এবং এক বা একাধিক রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো খাবার খেলে মানুষের বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি ও স্মরণশক্তি হ্রাস পায়। মানুষ মেধাহীন হয়ে পড়ে। শরীরের জিনজাত স্নায়ুকোষগুলোর আয়ুও এসব ভেজাল ও রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত খাবার খাওয়ার ফলে কমে যায়। দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, স্বাদ গ্রহণের শক্তি, ঘ্রাণ নেয়ার ক্ষমতা হ্রাস পায়। শরীরে বাসা বাঁধে মরণব্যাধি ক্যান্সার সহ নানান রোগ-ব্যাধি। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হ'ল-

ভেজালের সংজ্ঞা :

আভিধানিক অর্থ : ভেজাল শব্দের অর্থ : মিশ্রিত, মেকি; খাঁটি নয় এমন (ভেজাল দুধ, ভেজাল ঘি), উৎকৃষ্ট দ্রব্যের সঙ্গে নিকৃষ্ট দ্রব্যের মিশ্রণ (ভেজাল দেওয়া)। ভেজালের আরবী প্রতিশব্দ হ'ল اَلْغِشُّ، مَغْشُوْشٌ، مَمْذُوْقٌ مُزَيَّفٌ তবে পণ্যে ভেজাল প্রদানের ক্ষেত্রে الغش শব্দটিই বেশী ব্যবহৃত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও এক্ষেত্রে غَشَّ শব্দ ব্যবহার করেছেন।

وإنما اشةهر اسم الغش فى مجال المعاملاة الةجارية لأنه الميدان أحكام الغش التجارى শীর্ষক অভিসন্দর্ভে বলা হয়েছে, الذى يتجلى فيه الغش بوضوح ويكثر وقوعه فيه نتيجة الحرص على جمع المال وزيادة الثروة –'ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে الغش বা প্রতারণা শব্দটি বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে প্রতারণা মোটাদাগে ধরা পড়ে এবং সম্পদ জমা ও বৃদ্ধির লোভের ফলশ্রুতিতে এক্ষেত্রে বেশী প্রতারণা সংঘটিত হয়'।

ইবনু ফারিস বলেন, (غَشَّ) الْغَيْنُ وَالشِّيْنُ أُصُولٌ تَدُلُّ عَلَى ضَعْفٍ فِي الشَّيْءِ وَاسْتِعْجَالٍ فِيهِ، مِنْ ذَلِكَ الْغِشُّ – '(গাশ্শা) গাইন ও শীন মূল অক্ষর। যা কোন জিনিসের মধ্যে কিছু বৃদ্ধি করা ও তাতে তাড়াহুড়া করাকে বুঝায়। এখান থেকে এসেছে الغش 'প্রতারণা' বা ভেজাল'। ইবনু মানযূর বলেন, الغِشُّ: نَقِيضُ النُّصْح وَهُوَ مأْخوذٌ مِنَ الغَشَش المَشْرَب الكدِر؛ وَمِنْ هَذَا الغِشُّ فِي الْبِيَاعَاتِ. 'নছীহতের বিপরীত হ'ল الغش। এটি الغَشَش থেকে গৃহীত। অর্থ: ঘোলা পানি। এ অর্থের উপর ভিত্তি করে ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা দেয়া বা ভেজাল প্রদানের ক্ষেত্রে الغش শব্দটি ব্যবহৃত হয়'।

الغش শব্দটি অভিধানে কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর সবগুলোই একটি অর্থকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। সেটি হ'ল اَلْخِدَاعُ বা প্রতারণা। এছাড়া অন্য আরো যেসব অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলি হল :-

১. المخالطة 'সংমিশ্রণ'। الشَّيْءُ المَغْشُوشُ أَى الغَيْرُ الخَالِصُ 'মিশ্রিত/ভেজাল হল যা খাঁটি নয়'। কারণ এর সাথে অন্য কিছু মেশানো হয়েছে। যেমন বলা হয়, لَبَنٌ مَغْشُوْشٌ أَىْ مَخْلُوْطٌ بِالْمَاءِ 'পানিমিশ্রিত দুধ', فِضَّةٌ مَغْشُوشَةٌ أى مَخْلُوطَةٌ بالنُّحَاسِ 'তামামিশ্রিত চাঁদি'।

২. الإفساد 'নষ্ট করা'। এটি غشيش الْخُبْزِ إِذَا فَسَدَ অর্থাৎ রুটি বাসি হওয়া থেকে নেয়া হয়েছে।

পারিভাষিক অর্থ : 'নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩'-এর প্রথম অধ্যায়ের ২-এর ২৯ ধারায় ভেজালের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলা হয়েছে,

(২৯) 'ভেজাল খাদ্য' অর্থ এমন কোন খাদ্য বা খাদ্যদ্রব্যের অংশ,-

(ক) যাহাকে রঞ্জিত, স্বাদ-গন্ধযুক্ত, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ বা আকর্ষণীয় করিবার জন্য এইরূপ পরিমাণ উপাদান দ্বারা মিশ্রিত করা হইয়াছে, যে পরিমাণ উপাদান মিশ্রিত করা মানব-স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং যাহা কোন আইনের অধীন নিষিদ্ধ; বা

(খ) যাহাকে রঞ্জিতকরণ, আবরণ প্রদান বা আকার পরিবর্তন করিবার জন্য এমন কোন উপাদান মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে মিশ্রিত করা হইয়াছে যাহার ফলে মূল খাদ্যদ্রব্যের ক্ষতি সাধিত হইয়াছে এবং যাহার ফলে তার গুণাগুণ বা পুষ্টিমান হ্রাস পাইয়াছে; বা

(গ) যাহার মধ্য হইতে কোন স্বাভাবিক উপাদানকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অপসারণপূর্বক অপেক্ষাকৃত স্বল্প মূল্যের ভিন্ন কোন উপাদান মিশ্রিত করিবার মাধ্যমে আপাতঃ ওজন বা পরিমাণ বৃদ্ধি বা আকর্ষণীয় করিয়া খাদ্যক্রেতার আর্থিক বা স্বাস্থ্যগত ক্ষতি সাধন করা হয়'।

উক্ত আইনের প্রথম অধ্যায়ের ২ (১৬) ধারায় বলা হয়েছে, 'নকল খাদ্য' অর্থ বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের অনুকরণে অননুমোদিতভাবে অনুরূপ খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রস্তুত বা লেবেলিং করা, যাহার মধ্যে অনুমোদিত খাদ্যের উপাদান, উপকরণ, বিশুদ্ধতা ও গুণগত মান বিদ্যমান থাকুক বা না থাকুক'।

আল-মুনাবী (৯৫২-১০৩১ হিঃ) বলেন, الغش: ما يخلط من الرديء بالجيد 'ভাল পণ্যের সাথে খারাপ বা নিম্নমানের পণ্য মিশ্রিত করাকে ভেজাল বলে'।

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক চ্যান্সেলর শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আববাদ (জন্ম: ১৩৫৩ হিঃ) বলেন, والغش هو الشيء فيه عيب فيخفيه البائع ويبيعه على أساس أن ظاهره السلامة، ولكنه من الداخل على عكس الذي يراه الناس، مثل أن تكون الأطعمة التي تباع ظاهرها جميل، ولكن إذا قُلِّبَتْ ونُكِسَتْ وُجِدَ أسفلها يختلف عن أعلاها، فهذا من الغش، 'বিক্রেতা কোন পণ্যের ত্রুটি গোপন করে এমনভাবে তা বিক্রি করে যে, বাহ্যিকভাবে সেটাকে ভাল-নিরাপদ মনে হয়। কিন্তু মানুষ যা দেখে ভেতরটা তার বিপরীত। যেমন বিক্রীত খাদ্যদ্রব্যের বাহ্যিকটা দেখতে সুন্দর। কিন্তু উল্টিয়ে-পাল্টিয়ে দেখলে তার নিচেরটা উপরের অংশের সম্পূর্ণ বিপরীত পাওয়া যায়। এটাই হ'ল প্রতারণা বা ভেজাল'।

আধুনিক গবেষক মুহাম্মাদ আব্দুল করীম নাসমান খাদ্যে ভেজালের সংজ্ঞায় বলেন, تقديم المواد الغذائية للمستهلك علي خلاف المواصفاة والمقاييس الفنية للدولة 'রাষ্ট্র নির্ধারিত গুণ ও মানের বিপরীত খাদ্যদ্রব্য ভোক্তাকে সরবরাহ করাকে ভেজাল খাদ্য বলে'।

মোটকথা, ভেজাল বলতে কেবল পণ্যসামগ্রীতে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য বা পদার্থের মিশ্রণকেই বুঝায় না; বরং পণ্যের ত্রুটি গোপন করা, ভাল পণ্যের সাথে খারাপ বা নিম্নমানের পণ্য মিশ্রিত করা, দুধের সাথে পানি মেশানো, জাল মুদ্রার প্রচলন ঘটানো, মাপে ও ওযনে কম দেয়া, পণ্যের গুণগত মান সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য প্রদান, মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি করা, মিথ্যা বিজ্ঞাপন প্রচার এগুলি সবই ভেজাল ও প্রতারণার শামিল।[15] ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, والغش يدخل فى البيوع بكتمان العيوب وتدليس السلع، مثل أن يكون ظاهر المبيع خيرا من باطنه- 'ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্যের ত্রুটি গোপন করা ও তাতে ভেজাল প্রদান করা ধোঁকার শামিল। যেমন, পণ্যের উপরের অংশ নিচের অংশের চেয়ে ভাল হওয়া' তিনি আরো বলেন,

ويدخل فى الصناعات مثل الذين يصنعون المطعومات من الخبز والطبخ والعدس والشواء و غير ذلك، أو يصنعون الملبوسات كالنساجين والخياطين ونحوهم، أو يصنعون غير ذلك من الصناعات، فيجب نهيهم عن الغش والخيانة والكتمان. ومن هؤلاء الكيماوية الذين يغشون النقود والجواهر والعطر وغير ذلك-

'পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ধোঁকা বা ভেজাল প্রদান করা হয়। যেমন যারা রুটি তৈরী করে, খাবার রান্না করে, ডাল, কাবাব প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করে অথবা যারা পোষাক তৈরী করে যেমন, তাঁতী, দর্জি প্রমুখ অথবা যারা অন্যান্য পণ্য উৎপাদন করে তাদের কর্তব্য হ'ল প্রতারণা, খিয়ানত ও পণ্যের ত্রুটি গোপন করা থেকে বিরত থাকা। এদের মধ্যে রয়েছে রসায়নবিদগণ যারা জাল মুদ্রা তৈরী করে এবং মণি-মুক্তা ও আতর প্রভৃতিতে ভেজাল প্রদান করে'

ইসলামের দৃষ্টিতে পণ্যে ভেজাল প্রদানের বিধান :

ইসলামে পণ্যে ভেজাল প্রদান সম্পূর্ণরূপে হারাম। এ মর্মে কুরআন ও সুন্নাহর দলীল সমূহ নিম্নে আলোচিত হ'ল :

ক. কুরআনের দলীল :

১. মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا 'শৃংখলা স্থাপনের পর তোমরা পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করো না' (আ'রাফ ৭/৫৬)।

উক্ত আয়াতে 'আমভাবে যাবতীয় ফাসাদ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। তন্মধ্যে খাদ্যদ্রব্য বা পণ্যে ভেজাল প্রদান অন্যতম। আধুনিক মুফাস্সির ইবনু আশূর (১৮৭৯-১৯৭৩) বলেন, فالإفساد في الأرض منه تصيير الأشياء الصالحة مضرة كالغش في الأطعمة، 'পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে ভাল জিনিস সমূহকে ক্ষতিকারকে পরিণত করা। যেমন খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল প্রদান করা'।

২. আল্লাহ বলেন, وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ‘যখন সে ফিরে যায় (অথবা নেতৃত্বে আসীন হয়), তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির এবং শস্য ও প্রাণী বিনাশের চেষ্টা করে। অথচ আল্লাহ অশান্তি পসন্দ করেন না’ (বাক্বারাহ ২/২০৫)।

উক্ত আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টির অন্যতম রূপ হ’ল, মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করা। যার প্রভাব তাদের জীবন, সন্তান-সন্ততি, ফল-ফসল ও গবাদিপশুর উপর গিয়ে পড়ে। এর সবগুলিই খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল প্রদানের ফলে ঘটে থাকে।

৩. মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ- ‘ন্যায্য কারণ ব্যতীত কাউকে হত্যা করবে না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন’ (আন‘আম ৬/১৫১)।

এ আয়াতে অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। যেভাবেই তা হোক না কেন। আর খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল প্রদান ধীরে ধীরে মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় বিধায় তা হারাম।

৪. মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ[16] ‘আর তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের সম্পদ ভক্ষণ করো না এবং অন্যের সম্পদ গর্হিত পন্থায় গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তোমরা জেনেশুনে তা বিচারকদের নিকট পেশ করো না’ (বাক্বারাহ ২/১৮৮)।

আয়াতটি দু’দিক থেকে খাদ্যে ভেজাল প্রদান হারাম হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে। ক. অন্যায়ভাবে যেকোন পন্থায় মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করতে আয়াতে নিষেধ করা হয়েছে। তন্মধ্যে খাদ্যে ভেজাল অন্যতম। খ. ক্রেতা নির্ভেজাল ও নিরাপদ পণ্য ক্রয় এবং এর দ্বারা পরিপূর্ণরূপে উপকৃত হওয়ার জন্য বিক্রেতাকে সম্পূর্ণ মূল্য প্রদান করে। যদি পণ্যে ভেজাল থাকে তাহলে কখনো কখনো তা মূল্য কমে যাওয়ার কারণ হতে পারে। এভাবে ভেজাল প্রদানের ফলে পণ্যের মূল্য যতটুকু কম হবে ততটুকু বিক্রেতা ক্রেতার মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করেছে বলে গণ্য হবে।

৫. মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ[17] ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না, তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা ব্যতীত’ (নিসা ৪/২৯)।

দু’দিক থেকে উক্ত আয়াতটি ভেজাল হারাম হওয়ার দলীল বহন করে। ক. যেকোন পন্থায় অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণ করা। পণ্যে ভেজাল প্রদান এর অন্যতম মাধ্যম। খ. ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার অন্যতম শর্ত হ’ল সম্মতি। এমনকি কতিপয় মালেকী বিদ্বান একে প্রথম রুকন হিসাবে গণ্য করেছেন। আর এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, পণ্য ক্রয়কারী ভেজাল ছাড়াই তা ক্রয় করতে সম্মত হয়। কেননা ভেজালে প্রতারণা ও ক্ষতি রয়েছে। তাই কোন পণ্যে ভেজাল পরিদৃষ্ট হলে তা সম্মতিকে নষ্ট করে দেয়। অতএব প্রমাণিত হ’ল যে, পণ্যে ভেজাল প্রদান হারাম।

৬. আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ[18] ‘হে মুমিনগণ! তোমরা (অবাধ্যতার মাধ্যমে) আল্লাহ ও রাসূলের সাথে খিয়ানত করো না এবং (এর অনিষ্টকারিতা) জেনে-শুনে তোমাদের পরস্পরের আমানত সমূহে খিয়ানত করো না’ (আনফাল ৮/২৭)।

যা কিছু মানুষ অন্যকে আদায় করে সে বিষয়ে আমানতের খিয়ানত হারাম হওয়ার ব্যাপারে আয়াতটি ‘আম (কুরতুবী)। তন্মধ্যে খাদ্যদ্রব্যও রয়েছে। আর মানুষ পণ্যের গুণাগুণ, কার্যকারিতা, মাপ ও ওযন

---

[16]sura bakara 188
[17]sura nisa 29
[18]sura anfal 27

প্রভৃতি বিষয়ে কাউকে বিশ্বস্ত মনে না করলে তার নিকট থেকে তা ক্রয় করে তার দ্বারা উপকৃত হতে চাইবে না। পণ্যে ভেজাল প্রদান এর বিপরীত। কাজেই প্রমাণিত হল যে, পণ্যে ভেজাল প্রদান হারাম।

৭. মহান আল্লাহ বলেন,[19] يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوْا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক' (তওবা ৯/১১৯)।

আল্লাহ তা'আলা সর্বাবস্থায় এবং সকল কথা ও কাজে সত্যবাদিতা অবলম্বন করাকে আবশ্যক করেছেন। এটি এসব বিষয়ে মিথ্যা হারাম হওয়ার প্রমাণ বহন করে। পণ্যে ভেজাল প্রদানও এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ মিথ্যা তথ্য প্রদানের মাধ্যমে ভেজাল জিনিস বাজারজাত করা হয়। এতে ক্রেতাকে ধোঁকা দিয়ে চড়ামূল্য হাতিয়ে নেয়া হয়।

৮. আল্লাহ বলেন, وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِيْنَ، الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ، وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ[20] 'দুর্ভোগ মাপে কম দানকারীদের জন্য। যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় নেয় এবং যখন লোকদের মেপে দেয় বা ওযন করে দেয়, তখন কম দেয়' (মুতাফফিফীন ৮৩/১-৩)।

উক্ত আয়াতগুলি পণ্য আদান-প্রদানের সময় সঠিকভাবে তা মাপা ও ওযন করা আবশ্যক হওয়া এবং মাপে ও ওযনে কম দেয়া হারাম হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে। কারণ তা প্রতারণা। মানুষের মনে এর দারুণ প্রভাব বিস্তার করে। কারণ বিক্রেতার কাছ থেকে তার অসম্মতিতে বেশী নিলে যেমন সে কষ্ট পাবে, তেমনি ক্রেতাকে কম দিলে তারও একই অবস্থা হবে (কুরতুবী)। এতে ক্রয়-বিক্রয়ে সম্মতির যে শর্ত রয়েছে তা ভঙ্গ হবে। তাছাড়া ওযনে কম দেয়া প্রতারণা বা ভেজালের অন্যতম মাধ্যম। কাজেই তা হারাম।

খ. হাদীছের দলীল :

বেশ কিছু হাদীছে পণ্যে ভেজাল প্রদান হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হ'ল:

১. আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا 'যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। যে ব্যক্তি আমাদেরকে ধোঁকা দিবে সেও আমাদের দলভুক্ত নয়'।

শামসুল হক আযীমাবাদী বলেন, وَالْحَدِيْثُ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيْمِ الْغِشِّ وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ 'হাদীছটি প্রতারণা বা ভেজাল হারাম হওয়ার দলীল। এ বিষয়ে সবাই একমত'।যে কোন ধরনের প্রতারণা এবং তার উপায় অবলম্বনকে এই হারাম হওয়া শামিল করে। তন্মধ্যে পণ্যে ভেজাল প্রদান অন্যতম।

২. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ : مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ : أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَىْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّى – আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন একটি খাদ্যস্তূপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলে তাঁর হাত ভিজে গেল। তিনি বললেন, হে খাদ্যের মালিক! এটা কি? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তাহ'লে তুমি কেন ভিজা অংশটি উপরে রাখলে না? তাহলে লোকেরা দেখে নিতে পারতো। মনে রেখ, যে প্রতারণা করে, সে আমার দলভুক্ত নয়'। পণ্যে ভেজাল প্রদান হারাম হওয়ার ব্যাপারে হাদীছটি দ্ব্যর্থহীন।

[19] sura tawba 119
[20] sura mutoffifin 1 to 3

৩. বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন, فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ‘তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সম্মান তোমাদের জন্য সম্মানিত’।

জীবন, সম্পদ ও সম্মানের ক্ষেত্রে সীমালংঘন কঠিনভাবে হারাম হওয়ার ব্যাপারে হাদীছে জোরালো তাকীদ রয়েছে। সেটা যেভাবেই হোক না কেন। খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল প্রদানের ক্ষতিকর প্রভাব এর সবগুলোর উপরেই প্রযোজ্য। কারণ খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল প্রদান মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। এর মাধ্যমে অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ করা হয় এবং সন্তানদের ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। যেটিকে সম্মান নিয়ে বাড়াবাড়ি বা সীমালংঘন হিসাবে গণ্য করা যায়।

৪. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ ‘ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না এবং কারো ক্ষতি করো না’।

উক্ত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্যের ক্ষতিসাধন করতে নিষেধ করেছেন। এটি সাধারণ নিষেধ, যা সকল প্রকার ক্ষতিকে শামিল করে। আর পণ্যে ভেজাল প্রদানের ফলে ব্যক্তি ও সমষ্টি পর্যায়ে জীবন ও সম্পদের যে ক্ষতি সাধিত হয় তা বলাই বাহুল্য।

৫. আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, একজন ব্যক্তি নবী (ছাঃ)-এর নিকট উল্লেখ করলেন যে, তাঁকে ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা দেয়া হয়। তখন তিনি বললেন, إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ ‘যখন তুমি ক্রয়-বিক্রয় করবে তখন বলে নিবে কোন প্রকার ধোঁকা ও প্রতারণা নেই’।[২৪]

উক্ত হাদীছ দ্বারা দু’ভাবে পণ্যে ভেজাল প্রদান হারাম হওয়া প্রমাণিত হয়। ক. বিক্রেতার জন্য ক্রেতাকে কোন পণ্যে ধোঁকা দেয়া জায়েয নেই। সেটা খাদ্যদ্রব্য হোক বা অন্য কিছু। খ. পণ্যের মূল্য বা পণ্যে প্রভাব বিস্তারকারী প্রতারণা হ’লে বিক্রয় সাব্যস্ত হবে না। যদি পণ্যে ভেজাল প্রদানের মাধ্যমে ধোঁকা দেয়া জায়েয হত তাহলে বিক্রয় সাব্যস্ত হওয়া আবশ্যক হত। নিম্নের হাদীছটি এ ব্যাখ্যাকে জোরালো করে।

৬. হাকীম বিন হিযাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا- أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا- فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا ‘ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের অবকাশ থাকবে (ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি ভঙ্গ করার), যতক্ষণ না তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়। যদি তারা সততা অবলম্বন করে ও পণ্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে, তাহলে তাদের দু’জনের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত দান করা হবে। আর যদি তারা পণ্যের দোষ গোপন করে এবং মিথ্যার আশ্রয় নেয় তাহ’লে তাদের ক্রয়-বিক্রয় থেকে বরকত নির্মূল হয়ে যাবে’।

উক্ত হাদীছটি তিন দিক থেকে ভেজাল হারাম হওয়ার প্রমাণ বহন করে। ক. কল্যাণ ও প্রয়োজনের দিকে খেয়াল করে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য খিয়ার (ক্রয়-বিক্রয় কার্যকরকরণ বা বাতিলের স্বাধীনতা) বিধিসম্মত করা হয়েছে। আর তা হ’ল প্রতারণা প্রতিরোধ এবং উভয়কে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা। যদি ভেজাল প্রদান করা জায়েয হত তাহ’লে খিয়ার বিধিসম্মত করা অনর্থক হয়ে যেত। অথচ শরী‘আতকে এ থেকে পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে।

খ. পণ্যের যে ত্রুটি সম্পর্কে বিক্রেতা জ্ঞাত তা বলে দেয়া এবং ক্রয়-বিক্রয়ে সততা অবলম্বন করাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওয়াজিব বা আবশ্যক করেছেন। এর উপর বিক্রয়ে বরকত ভিত্তিশীল সে কথাও তিনি বলেছেন। যদি ভেজাল প্রদান জায়েয হত তাহলে তিনি তা আবশ্যক করতেন না।

গ. মিথ্যার আশ্রয় নেয়া ও ত্রুটি গোপন করা খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল প্রদানের অন্যতম উপায়। এর ফলে বরকত নির্মূলের কথা উক্ত হাদীছে বলা হয়েছে। কাজেই প্রমাণিত হল যে, ভেজাল হারাম।

৭. ‘আদ্দা বিন খালেদের হাদীছে এসেছে, هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم، اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً لاَ دَاءَ وَلاَ غَائِلَةَ وَلاَ خِبْثَةَ بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থেকে ‘আদ্দা

বিন খালেদ বিন হাওযা একটি দাস বা দাসী ক্রয় করল। যার কোন অসুখ নেই, যা পলায়নপর নয় এবং চরিত্রহীনও নয়। এটা হ'ল এক মুসলমানের সাথে অন্য মুসলমানের ক্রয়-বিক্রয়'।

উক্ত হাদীছে গুপ্ত দোষ লুকানো, কৌশল অবলম্বন করা এবং যার মধ্যে প্রতারণা ও হারাম রয়েছে তা বিক্রি করতে নিষেধ করা হয়েছে।দাস-দাসীর ক্ষেত্রে যদি এ বিধান প্রযোজ্য হয় তাহলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তা ভেজালের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

৮. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ 'ক্রয়-বিক্রয় কেবল পারস্পরিক সম্মতিতে অনুষ্ঠিত হয়'।

উক্ত হাদীছে সম্মতির ভিত্তিতে পণ্যের বিক্রয় সংঘটিত হওয়াকে আবশ্যক ঘোষণা করা হয়েছে। ভেজাল এই শর্তের খেলাফ। কাজেই তা হারাম।

৯. আবূ যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ – قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَ مِرَارٍ. قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ 'আল্লাহ কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর মানুষের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। বরং তাদের জন্য রয়েছে ভয়ানক শাস্তি। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ কথাটি তিনবার বললেন। আবু যার (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কারা ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে? তিনি বললেন, (১) যে ব্যক্তি অহংকারবশত টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরে (২) যে ব্যক্তি দান করে খোটা দেয় এবং (৩) যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে অধিক দামে পণ্য বিক্রি করে ও তা চালু করার চেষ্টা করে'।

বিক্রির জন্য ক্রেতার নিকট পণ্য উপস্থাপন করার সময় মিথ্যা বলা হারাম হওয়ার প্রতি হাদীছটি নির্দেশ করে। আর মিথ্যার আশ্রয় নেয়া পণ্যে ভেজাল প্রদানের অন্যতম মাধ্যম। অতএব প্রমাণিত হল যে, ভেজাল হারাম।

১০. আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বলেন, يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللهِ أَنْ تُدْرِكُوْهُنَّ 'হে মুহাজিরগণ! তোমরা পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। তবে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন তোমরা তার সম্মুখীন না হও'। তন্মধ্যে তিনি উল্লেখ করেন, وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلاَّ أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. 'যখন কোন জাতি ওযন ও পরিমাপে কারচুপি করে তখন তাদের উপর নেমে আসে দুর্ভিক্ষ, কঠিন বিপদ-মুছীবত এবং শাসকদের যুলুম-অত্যাচার'।

হাদীছটি মাপে ও ওযনে কম প্রদান হারাম হওয়ার দলীল। এটি পণ্যে ভেজাল প্রদানের অন্যতম মাধ্যম। এর ফলশ্রুতিতে দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি ও খাদ্য ঘাটতির সৃষ্টি হয় এবং সমাজের মানুষের উপর যালেম শাসকরা চেপে বসে।

১১. আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ 'তোমরা উটনী ও বকরীর দুধ (স্তনে) আটকিয়ে রেখো না। যে ব্যক্তি এরূপ পশু ক্রয় করে, সে দুধ দোহনের পরে দু'টি অধিকারের যেটি তার পক্ষে ভাল মনে করবে তাই করতে পারবে। যদি সে ইচ্ছা করে তবে ক্রীত পশুটি রেখে দিবে আর যদি ইচ্ছা করে তবে তা ফেরৎ দিবে এবং এর সাথে এক ছা' পরিমাণ খেজুর দিবে।

আলোচ্য হাদীছটি পণ্যে ভেজাল প্রদান হারাম হওয়ার প্রমাণ বহন করে। কারণ ক্রেতাকে ইচ্ছাকৃতভাবে ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে পশুর স্তনে দুধ আটকিয়ে রাখা হয়েছে। যা বিক্রেতা অবগত, কিন্তু ক্রেতা অনবগত। আর নিঃসন্দেহে প্রতারণা বা ধোঁকা দেয়া হারাম।

ভেজালের ব্যাপারে সালাফে ছালেহীনের সতর্কতা :

সালাফে ছালেহীন বা পূর্ববর্তী যুগের পুণ্যবান মুসলমানরা পণ্যদ্রব্যের দোষ-ত্রুটি স্পষ্টভাবে বলে দিতেন এবং ভেজাল প্রদান থেকে সর্বদা বিরত থাকতেন। তাঁরা লেনদেনে সর্বদা ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে বেঁচে থাকতেন এবং ব্যবসায় সততার পরিচয় দিতেন।

বিশিষ্ট ফকীহ ইবনু সিরীন একটি ছাগী বিক্রি করার সময় ক্রেতাকে বললেন, তোমার নিকট ছাগীটির দোষ বর্ণনা করে আমি দায়িত্বমুক্ত হতে চাই। সে পা দিয়ে ঘাস এদিক-ওদিক ছড়ায়। হাসান বিন ছালেহ একটি ক্রীতদাসী বিক্রি করার সময় ক্রেতাকে বললেন, মেয়েটি একবার থুথুর সাথে রক্ত ফেলেছিল। এটি মাত্র একবারের ঘটনা ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঈমানের তাগিদ হেতু তিনি তা উল্লেখ না করে চুপ থাকতে পারেননি। যদিও তাতে মূল্য কম পাওয়ার আশংকা ছিল।

তারা ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত বাণীর প্রতি আমলকারী। উকবা বিন আমির (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلاَّ بَيَّنَهُ لَهُ 'মুসলমান মুসলমানের ভাই। সুতরাং কোন মুসলমানের পক্ষে পণ্যের ত্রুটি বর্ণনা না করে নিজের ভাইয়ের কাছে তা বিক্রি করা বৈধ নয়'।

বাংলাদেশে ভেজালের চিত্র :

বাংলাদেশে ব্যবসায়ীরা ভেজাল প্রদানের বল্গাহীন প্রতিযোগিতায় নেমেছে। আমাদের দেশে সম্ভবতঃ এমন কোন পণ্য বা খাদ্য নেই, যাতে ভেজাল দেয়া হচ্ছে না। এজন্যই সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) পঞ্চম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বলেছেন, 'কচু ছাড়া সবকিছুতেই ফরমালিন। নির্ভেজাল খাবার পাওয়া এখন দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে। খাদ্যে ভেজালের কারণে ক্যান্সারসহ জটিল রোগ হচ্ছে। কিছু মানুষ দানব হয়ে যাচ্ছে'।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অস্ট্রেলিয়ার ওলিংগং বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে গবেষণা জরিপ করে দেখেছে যে, দেশের মোট খাদ্যের ৩০ শতাংশে ভেজাল রয়েছে। সয়াবিন তেল, চিনি, মসলা, নুডুলস, সেমাই, বিস্কুট, পাউরুটি, দুধ, শিশুখাদ্য, ঘি, মিষ্টি, মধু, পানীয়, ফলমূল, ঔষধ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি প্রায় সবকিছুতেই ভেজাল দেয়া হচ্ছে। গত ১০ই আগস্ট ২০১১ তারিখে ঢাকায় 'জাতীয় জীবনে ভেজাল খাদ্যের ঝুঁকিপূর্ণ প্রভাব' শীর্ষক আলোচনা সভায় 'ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডাইরিয়াল ডিজিজ রিসার্চ, বাংলাদেশ' (আইসিডিডিআরবি)-এর জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী এস কে রয় এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলেন, মিষ্টি, সন্দেশ, দই, ঘি, ছানা, সস, ডালডা, সয়াবিন, আইসক্রীমসহ কিছু পণ্য ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ৭৬ দশমিক ৩২ শতাংশ খাবারেই ভেজাল। ঐ আলোচনায় বক্তারা বলেন, খাবারে প্রায় ২০০ ধরনের বিষাক্ত পদার্থ ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রায় সব ফলেই ফরমালিন, কার্বাইড অথবা অন্য কোন রাসায়নিক স্প্রে করা হয়। একটি ইংরেজী দৈনিক লিখেছে, The another name of carbide is cancer. There is no answer of cancer. 'কার্বাইডের অপর নাম ক্যান্সার। আর ক্যান্সারের পরিণাম নিশ্চত মৃত্যু'। এসব ভেজাল খাবার খেয়ে মানুষ নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। একটি গবেষণা থেকে জানা গেছে, বাংলাদেশে প্রতিবছর ১০ হাযার কোটি টাকা নষ্ট হচ্ছে ভেজাল খাবার খাওয়ার কারণে। কারণ ভেজাল খাবার খাওয়ার কারণে নানা রোগ হচ্ছে। আর এসব রোগ নিরাময়ের জন্য ঔষধের পেছনে ১০ হাযার কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে।

দুধে ভেজাল : ২০০৮ সালে গুঁড়োদুধে মেলামাইনের অস্তিত্ব পাওয়ার বিষয়টি গোটা বিশ্বে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছিল। মেলামাইনযুক্ত গুঁড়োদুধ খেয়ে সে সময় চীনে প্রায় তিন লাখ শিশু অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। ৬ জন শিশু মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল।[45] চীন সরকারের হিসাব অনুযায়ী দেশটির গুঁড়োদুধ উৎপাদনকারী ২২ প্রতিষ্ঠানের ৬৯টি আইটেমেই বিষাক্ত উপাদান মেলামাইন পাওয়া গিয়েছিল। মূলতঃ দুধে প্রোটিনের পরিমাণ বেশী দেখানোর জন্যই মেশানো হয়েছিল এই রাসায়নিক পদার্থ। এ কেলেঙ্কারির মূল হোতা সানলু কোম্পানীকে দেওলিয়া ঘোষণা করা হয়েছিল। সে সময় বাংলাদেশের বাজারে প্রচলিত ইয়াশলি-১, ইয়াশলি-২ ও সুইট বেবী নামক তিনটি ব্র্যান্ডের গুঁড়োদুধে মেলামাইনের

অস্তিত্ব প্রমাণিত হওয়াই তা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, মেলামাইন কার্বন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেনের সম্বন্বয়ে গঠিত এক ধরনের জৈব যৌগ। যা মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োমেডিকেল রিসার্চ সেন্টারের সাবেক পরিচালক এবং ঔষধ প্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপক আ ব ম ফারুক ও তাঁর গবেষকদল দুধের ১০টি নমুনা পরীক্ষা করে ১০টিতেই ক্ষতিকর অ্যান্টিবায়োটিক পেয়েছেন। এদিকে গত ২৪শে জুলাই'১৯ পাস্তুরিত তরল দুধে মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর ভারী ধাতব পদার্থের উপস্থিতি প্রমাণিত হওয়ায় দেশের ১০টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা করেছে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

ঔষধে ভেজাল : নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের ঔষধের ছড়াছড়িতে মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে। ৯ জুলাই'১২ পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট মোতাবেক দেশে বর্তমানে ২৫৮টি এলোপ্যাথী, ২২৪টি আয়ুর্বেদী, ২৯৫টি ইউনানী ও ৭৭টি হোমিওপ্যাথিসহ মোট ৮৫৪টি ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ঔষধ কোম্পানীগুলোর মধ্যে বড় জোর ৪০টি ছাড়া বাকী প্রতিষ্ঠানগুলো নকল ও নিম্নমানের ঔষধ তৈরী করে বলে অভিযোগ আছে। এমনকি দু'টি ঔষধে ইয়াবার উপাদান পাওয়ার খবর পর্যন্ত সম্প্রতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

হলুদের গুঁড়ায় ভেজাল : স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণা সংস্থা 'ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডাইরিয়াল ডিজিজ রিসার্চ, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআরবি) ও যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের করা এক গবেষণায় হলুদে সীসা শনাক্ত করা হয়েছে, যা মানবদেহের ক্ষতি করে। বিশেষ করে গর্ভবতী নারী ও তার শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশ বাধাগ্রস্ত করে। প্রতিষ্ঠানদ্বয় তাদের গবেষণায় বাংলাদেশের ৯টি যেলার বাজার থেকে গুঁড়ো করার আগে সংগ্রহ করা হলুদের নমুনার ২০ শতাংশে সীসা বা লেড ক্রোমেট শনাক্ত করেছে। যা বিক্রির আগে হলুদের গায়ে ঘষে সেটি উজ্জ্বল করা হয়।

এই গবেষণায় আরো দেখা গেছে, ২০১১ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত আমদানী করা ১৭টি ব্র্যান্ডের প্যাকেট-জাত হলুদের গুড়া যুক্তরাষ্ট্র নয়বার ফেরত দিয়েছে। এসব কোম্পানির বেশীরভাগই ভারত ও বাংলাদেশের।

আইসিডিডিআরবি'র গবেষক ডঃ মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমানের মতে, এতে শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হওয়া ছাড়াও শিশুর ওযন কম হওয়া সহ অন্যান্য জটিলতা দেখা দিতে পারে। মায়ের গর্ভকালীন জটিলতা হতে পারে। এটি মানবদেহে হৃদযন্ত্রের সমস্যা তৈরি করতে পারে, রক্তের উচ্চচাপ দেখা দিতে পারে, মস্তিষ্কের স্নায়ুজনিত রোগ দেখা দিতে পারে।

কৃত্রিম উপায়ে গরু মোটাতাজাকরণ : একশ্রেণীর অসাধু খামারী নিষিদ্ধ ঔষধ প্রয়োগ করে কৃত্রিম উপায়ে গরু মোটাতাজা করে। তারা স্টেরয়েড গ্রুপের ঔষধ যেমন ডেকাসন, ওরাডেক্সন, প্রেডনিসোলন ইত্যাদি সেবন করিয়ে অথবা ডেকাসন, ওরাডেক্সন স্টেরয়েড ইনজেকশন দিয়ে গরুকে মোটাতাজা করে। এছাড়া হরমোন প্রয়োগ (যেমন ট্রেনবোলন, প্রোজেস্টিন, টেস্টোস্টেরন) করেও গরুকে মোটাতাজা করা হয়।

স্টেরয়েড দিয়ে মোটাতাজা করা গবাদিপশুর গোশত মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এজাতীয় ঔষধ অতিরিক্ত মাত্রায় দিলে গরুর কিডনি ও যকৃৎ অকার্যকর হয়ে যায়। এতে শরীর থেকে পানি বের হতে পারে না। ফলে পানি সরাসরি গরুর গোশতে চলে যায়। এতে গরুকে মোটা, তুলতুলে ও নাদুসনুদুস দেখায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মোটাতাজাকরণের এসব ঔষধের কার্যকারিতা নষ্ট হয় না। গরুর দেহের গোশতে থেকে যায়। এসব গোশত যখন মানুষ খায়, তখন ঔষধের প্রতিক্রিয়া মানুষের শরীরেও দেখা দেয়। স্টেরয়েড ঔষধ মানবদেহের কিডনি, ফুসফুস, লিভার, হৃৎপিন্ডকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয়। ফলে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, অনিদ্রা, অস্থিরতাসহ নানা

রোগের সৃষ্টি করে। এতে মানুষের শরীরে পানি জমে যাওয়া, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া, মূত্রনালী ও যকৃতের বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখা দিতে পারে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এসব ক্ষতিকর ঔষধ মানবশরীরে জমা হয়ে টিউমার, ক্যানসার, কিডনি নষ্ট করার মতো মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে। বিশেষ করে নারীদের গর্ভধারণের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

নিম্নমানের ১১ পণ্যের লাইসেন্স বাতিল : ল্যাবে পরীক্ষা করে নিম্নমান পাওয়ায় ৯ কোম্পানীর ১১ পণ্য উৎপাদনের লাইসেন্স বাতিল করেছে 'বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)। একই সঙ্গে পণ্যগুলো উৎপাদন এবং বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। পণ্যগুলো হচ্ছে- একে খান ফুড এ্যান্ড বেভারেজের ফার্টিফাইড সয়াবিন তেল, জে কে ফুডের মদিনা ব্র্যান্ডের লাচ্ছা সেমাই, মডার্ণ কসমেটিক্সের মডার্ণ ব্র্যান্ডের স্কিন ক্রীম, নিউ চট্টলার এরাবিয়ান স্পেশাল ব্র্যান্ডের ঘি, রেভেন ফুডের রেভেন ব্র্যান্ডের লাচ্ছা সেমাই, খাজানা মিঠাইয়ের খাজানা ব্র্যান্ডের লাচ্ছা সেমাই, ঘি ও চানাচুর, প্রমি এগ্রো ফুডের প্রমি ব্র্যান্ডের হলুদের গুঁড়া এবং ইফাদ সল্ট অ্যান্ড কেমিক্যালের ইফাদ ব্র্যান্ডের আয়োডিনযুক্ত লবণ।[53] ইতিপূর্বে গত ১২ই মে'১৯ প্রাণের হলুদ গুঁড়া, পাউডার ও লাচ্ছা সেমাই সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ৫২টি মানহীন ও ভেজাল পণ্য বাজার থেকে প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন হাইকোর্ট।

সারকথা হ'ল, আমরা প্রতিনিয়ত যেসব খাদ্য খাচ্ছি তার অর্ধেকই ভেজাল। শিশু খাদ্য থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা পণ্যে ভেজাল। ভেজালের ভিড়ে আসলটা চেনাই দুষ্কর।

ভেজাল প্রতিরোধে করণীয় :

১. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 'মা'রূফ' বা সুনীতির প্রতিষ্ঠা এবং 'মুনকার' বা দুর্নীতির প্রতিরোধ করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। অর্থনীতিতে সুনীতি প্রতিষ্ঠার অর্থ হচ্ছে যাবতীয় উপায়ে ইনছাফভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলা। আর দুর্নীতি প্রতিরোধের অর্থ হচ্ছে সব ধরনের অর্থনৈতিক দুর্নীতি ও শোষণের পথ রুদ্ধ করা। এলক্ষ্যে রাষ্ট্র যে কোন ধরনের আইন রচনা করতে পারে। আর সেই আইন প্রয়োগ করে ভেজাল প্রতিরোধ করতে পারে দৃঢ়হস্তে।

২. খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশ্রণ এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর খাদ্যসামগ্রী বিপণন রোধে স্থাপিত 'বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত'-কে সক্রিয় ও কার্যকর করতে হবে।

৩. খাদ্যে ভেজালের সর্বোচ্চ শাস্তি ১২ লক্ষ টাকা জরিমানা ও ৩ বছর কারাদন্ডের বিধা যথাযথভাবে প্রয়োগ করে খাদ্যে ভেজাল রোধ করা যেতে পারে। প্রয়োজনে অবস্থা বিবেচনা করে জরিমানা ও শাস্তির মেয়াদ বাড়ানো যেতে পারে। এমনকি ভেজাল প্রদানের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ডও দেয়া যেতে পারে। গোটা বিশ্বে শিশু-খাদ্যে ভেজালকারীদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ডের বিধান রয়েছে। সুতরাং শিশুরা যেহেতু জাতির ভবিষ্যত সেহেতু তাদের খাদ্যে ভেজাল প্রদানকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে এবং তা প্রতিরোধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। উল্লেখ্য যে, প্রতি বছর ভেজাল খাবার খেয়ে দেশের ১০ শতাংশ শিশু মারা যায়।

৪. 'বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন' (বিএসটিআই)-এর দায়িত্ব হচ্ছে খাদ্যসহ বিভিন্ন পণ্যের মান নিশ্চিতকরণ। খাদ্যসহ অন্যান্য পণ্যে ভেজাল রোধের জন্য এই প্রতিষ্ঠানটিকে ঢেলে সাজিয়ে প্রয়োজনীয় লোকবল দিয়ে একে একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে, যাতে তা সকল পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণ ও নিয়ন্ত্রণে সমর্থ্য হয়। তবে সর্ষের মধ্যে যেন ভূত না থাকে সেজন্য গোয়েন্দা নযরদারী বাড়াতে হবে।

৫. শুধু দেশে উৎপাদিত পণ্য নয়, বিদেশ থেকে আমদানীকৃত পণ্য স্বাস্থ্যসম্মত ও মানসম্মত কি-না তা পরীক্ষা করার জন্য উন্নত প্রযুক্তির সহায়তায় আমদানীকৃত পণ্য খালাসের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া দরকার। ভেজাল ও মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্য যাতে কোনভাবেই দেশে ঢুকতে না পারে সে ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে।

৬. কোন প্রতিষ্ঠান পণ্যে ভেজাল প্রদান করছে প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ বা সীল করে দিতে হবে। সাথে সাথে তা মিডিয়ায় ফলাও করে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে কেউ ভেজাল সন্ত্রাস করার দুঃসাহস না দেখায়।

৭. অধুনা মানুষ সাধারণতঃ ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় পণ্যের বিজ্ঞাপন দেখে তা কিনতে প্রলুব্ধ হয়। সুতরাং ভেজাল প্রতিরোধের জন্য এসব মাধ্যমে পণ্যের গুণগত মান যাচাই-বাছাই না করে বিজ্ঞাপন প্রচার নিষিদ্ধ করতে হবে।

৮. বাজারে প্রচলিত কোন কোন খাবারে কোন কোন ক্ষতিকারক উপাদান ভেজাল দেয়া হচ্ছে এবং নির্ভেজাল খাদ্য কোনগুলো এবং সেগুলো কোথায় পাওয়া যায় এ বিষয়ে একটা গাইডবুক প্রণয়ন করা যেতে পারে। এতে প্রতিটি খাদ্যসামগ্রী সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতামত থাকলে তাতে ক্রেতা সাধারণ উপকৃত হবে।

৯. ক্রেতারা যাতে ভেজাল পণ্য সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে পারে সেজন্য একটি 'ইনফরমেশন সেল' গঠন করতে হবে।

১০. ঔষধে ভেজালের ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। কোনক্রমেই যেন ভেজাল ও মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ বাজারে ব্যবসায়ীরা চালান না দিতে পারে সেদিক সুতীক্ষ্ণ নযর রাখতে হবে। প্রয়োজনে ভেজাল ও নকল ঔষধ তৈরীকারী কোম্পানী বন্ধ করে দিতে হবে।

১১. 'মোবাইল কোর্ট' বা ভ্রাম্যমাণ আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি করে এর কার্যক্রম সবসময় চালু রাখার জন্য দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী হাতে নিতে হবে। রাজধানী থেকে শুরু করে উপযেলা পর্যন্ত এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, ভ্রাম্যমাণ আদালত প্রতিষ্ঠায় শারঈ কোন বাধা নেই। ইমাম বুখারী (রহঃ) এর প্রমাণে তাঁর ছহীহ বুখারীর 'আহকাম' অধ্যায়ে بابُ الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا فِى الطَّرِيقِ 'রাস্তায় বিচারকার্য সম্পাদন ও ফৎওয়া দান' মর্মে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন। এরপর তিনি উল্লেখ করেছেন, وَقَضَى يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ فِى الطَّرِيقِ وَقَضَى الشَّعْبِىُّ عَلَى بَابِ دَارِهِ 'ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়া'মার রাস্তায় বিচারকার্য সম্পাদন করেছেন এবং শা'বী তাঁর বাড়ীর দরজায় বিচার করেছেন'। অতঃপর তিনি আনাস বিন মালেক (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন।

১২. খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য পণ্যে বাস্তবিকই ভেজাল দেয়া হয়েছে কি-না বা তাতে ক্ষতিকারক কোন উপাদান মিশিয়েছে কি-না, তা নির্ণয়ের জন্য প্রত্যেক মোবাইল কোর্টের সাথে অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান ও প্রয়োজনীয় অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি থাকতে হবে।

১৩. প্যাকেটজাত তেল, ঘি, চিনি, আটা, ময়দা, মসলা, বোতলজাত পানীয় ইত্যাদিতে ভেজালের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট হোটেল, রেস্তোরাঁ, ফাস্টফুডের দোকান ও বিপণী কেন্দ্রগুলোর মালিকদের বদলে পণ্য উৎপাদককে শাস্তি দিতে হবে।

১৪. কোন প্রতিষ্ঠান, উৎপাদক, পরিবেশক যেন অযথা হয়রানির শিকার না হন সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

১৫. ব্যবসায়ীরা বাজারে যাতে পচা মুরগী, পচা ডিম, পচা মাছ এবং এক গোশতের নাম করে আরেক গোশত চালিয়ে দিতে না পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৬. প্রত্যেক পাড়া-মহল্লায় ও ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে জনগণ ‘ভেজাল প্রতিরোধ কমিটি গঠন’ করে ভেজালের বিরুদ্ধে স্থানীয়ভাবে জনমত গড়ে তুলতে পারে। সাধারণ মানুষ ভেজালের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেই ভেজাল প্রদানকারীরা ভেজাল পণ্য বিপণন করতে সাহস পাবে না।

১৭. সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির জন্য ভেজাল সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি পাঠ্যসূচীভুক্ত করা যেতে পারে। তাছাড়া সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, সভা-সমাবেশ, জুম‘আর খুৎবা ও ওয়ায -মাহফিলে এ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা যেতে পারে।

১৮. সকল রাজনৈতিক, সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মসূচীতে ভেজাল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার কর্মসূচী অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।

১৯. ভেজালমুক্ত পণ্য উৎপাদক ও পরিবেশকদেরকে বছরান্তে সরকারীভাবে পুরষ্কৃত করতে হবে এবং মিডিয়ায় তা ফলাও করে প্রচার করতে হবে।

২০. নির্ভেজাল পণ্য উৎপাদনের জন্য উৎপাদকদেরকে সরকারীভাবে অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

২১. বাজারে কোন পণ্যে ভেজাল দেয়া হচ্ছে কি-না তা তদারকির ব্যবস্থা করতে হবে। ইসলামী শাসনামলে ‘মুহতাসিব’ এ দায়িত্ব পালন করতেন। মোল্লা আলী কারী হানাফী (রহঃ) মিশকাতের ২৮৬০ নং হাদীছের (فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ) এর ব্যাখ্যায় বলেন, فِيهِ إِيذَانٌ بِأَنَّ لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَمْتَحِنَ بَضَائِعَ السُّوقَةِ لِيَعْرِفَ الْمُشْتَمِلَ مِنْهَا عَلَى الْغِشِّ مِنْ غَيْرِهِ. ‘এখানে নির্দেশ রয়েছে যে, মুহতাসিবকে জনসাধারণের পণ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে। যাতে তিনি ভেজাল ও খাঁটি পণ্য চিনতে পারেন’।

২২. দেশের কৃষি বিজ্ঞানীদের এমন পদ্ধতি আবিষ্কার করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, যা বিষ মুক্তভাবে শস্য ও ফলমূল সংরক্ষণে সহায়ক হবে।

২৩. চাষী ও ব্যবসায়ীদেরকে আল্লাহর উপরে ঈমান বৃদ্ধি ও তাক্বদীরে বিশ্বাসী হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং তাদেরকে হালাল রুযী গ্রহণের প্রতি উৎসাহিত করতে হবে।

২৪. সর্বোপরি সাধারণ ভোক্তা বা জনগণকে সাধ্যপক্ষে ভেজাল খাদ্য ও পণ্য বর্জন করতে হবে, তাহলে ভেজালের কবল থেকে দেশ ও জাতি রক্ষা পেতে পারে।

মুনাফাখোরী, মজুদদারী, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও ভেজাল অক্টোপাসের ন্যায় আমাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। মজুদদার সিন্ডিকেটের কারসাজিতে দ্রব্যমূল্যের পাগলা ঘোড়া ছুটছে তো ছুটছেই। অন্যদিকে ভেজালের জয়জয়কার চলছে সর্বত্র। এমন কোন খাদ্য নেই যাতে ভেজাল দেয়া হচ্ছে না। ভেজালের সমুদ্রে যেন আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি। ইসলামে এ ধরনের কর্মকান্ড নিষিদ্ধ হ’লেও একশ্রেণীর দুনিয়াদার মুনাফাখোর ব্যবসায়ী অত্যধিক মুনাফার নেশায় বুঁদ হয়ে তা করে যাচ্ছে দিব্যি। তারা হালাল-হারামের কোন তোয়াক্কা করছে না। এ যেন কিয়ামতের পূর্বলক্ষণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لاَ يُبَالِى الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلاَلِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ ‘মানুষের নিকট এমন এক যুগ আসবে, যখন সে পরোয়া করবে না যে, সে কোথা হতে সম্পদ উপার্জন করল, হালাল হতে না হারাম হতে’।

আজকে মানুষের মধ্যে বড় অভাব তাক্বওয়ার। নৈতিক চেতনা তাদের মাঝে শূন্যের কোঠায়। সুতরাং ব্যবসায়ীদের মাঝে আল্লাহভীতি ও পরকালে প্রবল প্রতাপান্বিত প্রভুর কাছে জবাবদিহিতার মানসিকতা গড়ে না উঠলে এসব অর্থনৈতিক দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সুদূরপরাহত।

রাসূল (ছাঃ) তদানীন্তন অসভ্য-বর্বর জাহেলী সমাজের লোকদের মাঝে এমন নৈতিক বিপ্লবের আবহ সৃষ্টি করেছিলেন, যার ছোঁয়ায় অল্পদিনের ব্যবধানে মানুষগুলো সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিল। ভীতু সারমেয়-এর মত লেজ গুটিয়ে পালিয়েছিল যতসব অন্যায়-অকর্ম। আজো সমাজে যদি সেই আবহ ফিরিয়ে আনা যায়, তাহলে উল্লেখিত অপকর্মগুলো মূলোৎপাটিত হবে। দেশ-জাতি ও মানবতা রক্ষা পাবে মজুদদার-মুনাফাখোরদের কবল থেকে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে পিষ্ট হবে না সাধারণ জনগণ। ভেজালের বিষাক্ত ছোবলে জর্জরিত হবে না কেউ। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন! আমীন!!

পারমানবিক যুদ্ধঃ বর্তমান বিজ্ঞানের আরেক ভয়ংকর আবিস্কার পারমাণবিক বোমা ও অস্ত্র। যার আগ্রাসনে ঝরে যাচ্ছে হাজারো প্রান। ধ্বংশ হচ্ছে পরিবেশ, বসতি। কতোটা ভয়ঙ্কর এই যুদ্ধ তার নজিরা আমরা জাপানে হওয়া পারমানবিক যুদ্ধে দেখতে পাই।



হিরোসিমা–নাগাসাকি পৃথিবীর মানুষের কাছে নৃশংসতম বর্বরতার একটি প্রতিচ্ছবি হিসাবে বছরের পর বছর ধরে চিত্রিত হয়ে আসছে। হিরোশিমা–নাগাসাকির নাম শুনলেই ভয়ে আতঙ্কে ওঠে শান্তিপ্রিয় মানুষের মন। মনে পড়ে মানবজাতির বিরুদ্ধে পরিচালিত সর্বকালের সর্বনিকৃষ্ঠ বর্বরতা ও নৃশংসতার কথা। চোখের সামনে ভেসে ওঠে মানব সমাজকে হত্যার জন্য পরিচালিত সীমাহীন বর্বরতা ও নৃশংসতার প্রতিচ্ছবি। যেই বর্বরতা ও নৃশংসতায় কয়েক মিনিটের ব্যবধানে মৃত্যুবরণ করেছিল জাপানোর হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহরের লক্ষাধিক মানুষ । সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়েছিল আরো লক্ষাধিক মানুষ। মৃত্যুবরণ করেছিল লক্ষাধিক পশুপাখি ও মৎসজগত। আগুনে পুড়ে শেষ হয়ে গিয়েছিল সবুজ বৃক্ষরাজি আর গাছপালা। ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল দুটি জনপদে প্রানের স্পন্দন। এসব হচ্ছে জাপানের হিরোশিমা এবং নাগাসাকি শহরে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পারমাণবিক বোমা হামলার ভয়াবহ পরিণতি। হিরোশিমা এবং নাগাসাকির ওপর পারমাণবিক বোমা হামলার পঁচাত্তুর বছর অতিক্রান্ত হলেও বিশ্ববাসী এখনো পারমাণবিক বোমা হামলার হুমকি এবং আশংকা থেকে মুক্ত হতে পারেনি। এই অবস্থায় মানবজাতিকে যদি পারমাণবিক বোমার নৃশংসতা থেকে বাঁচাতে হয় তাহলে হিরোশিমা এবং নাগাসাকির পুনরাবৃত্তি যে কোন মুল্যে প্রতিরোধ করতে হবে। আমরা একটি পরমাণু অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব চাই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের হিরোশিমা আর নাগাসাকিতে যুক্তরাষ্ট্র যে পারমাণবিক বোমা হামলা চালায় তার ধ্বংসলীলা এখনো বয়ে বেড়াচ্ছে সেখানকার মানুষ। ১৯৪৫ সালের ৭ আগস্ট জাপানের হিরোশিমা নগরীতে যুক্তরাষ্ট্র প্রথম পারমাণবিক বোমা হামলা চালায়। স্থানীয় সময় সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে ‘লিটল বয়’ নামের এই বোমাটি নিক্ষেপ করা হয় যার ধ্বংসক্ষমতা ৬ দশমিক ৫ কিলোটন টিএনটির সমান। এই বোমার আঘাতে মুহূর্তের মধ্যে হিরোশিমা নগরী ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। প্রাণ হারায় এক লাখ ৪০ হাজার মানুষ। প্রাণ হারায় লক্ষাধিক পশু। গাছপালা সব পুড়ে যায়। পারমাণবিক বোমা থেকে সৃষ্ঠ আগুনের লেলিহান শিখা হিরোশিমা নগরীকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেয়। এর ঠিক তিন দিন পর ৯ আগস্ট জাপানের নাগাসাকি নগরীতে যুক্তরাষ্ট্র আবারো পারমাণবিক বোমা হামলা চালায়। স্থানীয় সময় বিকেল ৩টা ৪৭ মিনিটে ‘ফ্যাটম্যান’ নামের নিক্ষিপ্ত বোমাটির ধ্বংস ক্ষমতা হচ্ছে ২২ কিলোটন টিএনটির সমান। এখানে ও কয়েক মিনিটের ব্যবধানে

মৃত্যুবরণ করে সত্তর হাজার মানুষ। হিরোশিমার মত নাগাসাকিও আগুনের লেলিহান শিখায় জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যায়। হিরোশিমা এবং নাগাসাকির ওপর যে দুটি পারমাণবিক বোমা হামলা হয় তার তেজস্ক্রিয়তায় যুগ যুগ ধরে সেখানকার মানুষ, জীবজন্তু নানা ধরনের ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় এবং কত মানুষ এবং প্রাণি যে বিকলাঙ্গ হিসাবে জন্মগ্রহন করেছে এবং তার বোঝা বহন করেছে সারা জীবন তা হিসাবের বাইরে। মানবজাতির ওপর এত বড় ধ্বংসাত্মক ঘটনা এবং বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা পৃথিবীর ইতিহাসে আর একটিও ঘটেনি।

সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক বোমা তৈরীর কাজ শুরু করে। ১৯৪৫ সালের ১৪ জুলাই যুক্তরাষ্ট্র প্রথম দেশ হিসাবে নিউ মেক্সিকো রাজ্যে পারমাণবিক বোমার সফল পরীক্ষা চালায় এবং এর র্কাযকারিতা নিশ্চিত হয়ে আগষ্টের প্রথম সপ্তাহে জাপানের ওপর হামলা চালায়। হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পারমাণবিক বোমা হামলায় শহর দুটি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। মুহূর্তেই মারা যায় দু'লাখের ও বেশি মানুষ। এর কয়েকদিন পর ১৪ আগস্ট জাপান আত্মসমর্পণ করে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়। পারমাণবিক বোমার অধিকারী হওয়ার ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্র সামরিক ক্ষেত্রে একক এবং শ্রেষ্ঠতম শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়। পারমাণবিক বোমার ধ্বংস ক্ষমতা দেখে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ আতংকিত হয়ে ওঠে এবং নিজেরা ও সামরিক ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ হওয়ার লক্ষ্যে পারমাণবিক বোমার অধিকারী হওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। শুরু হয়ে যায় পারমাণবিক প্রযুক্তি অর্জন এবং পারমাণবিক বোমা তৈরির তী

মানব হত্যা নিয়ে যা বলে ইসলামঃ ইসলামপূর্ব যুগে পেশিশক্তির জোরে মানুষ অন্যায় করে বেড়াত। এমনকি মানুষকে হত্যা করতেও কোনো দ্বিধাবোধ করত না। কারণ তাদের মধ্যে গোত্রের সাথে গোত্রের সার্বক্ষণিক যুদ্ধ লেগে থাকত। মনে হতো, এটা যেন তাদের পেশা। অতঃপর মহানবী সা:-এর আগমন ঘটে। তিনি এসব অরাজকতা দেখে অস্থির হয়ে পড়তেন। আর আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন ও ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। অতঃপর ইসলামের আগমন হলে এসব হত্যা, রক্তপাত, অরাজকতা, সন্ত্রাস ও সহিংসতাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

মানুষ মহান আল্লাহ তায়ালার অনন্য সৃষ্টি। তিনি মানুষকে সৃষ্টিকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদায় আসীন করেছেন। তাঁর এই সৃষ্টির পেছনে রয়েছে এক মহৎ রহস্য। তাঁর মায়াময় এই সৃষ্টিকে ধ্বংস করা তাকে কষ্ট দেয়ার নামান্তর। তাই শান্তির ধর্ম ইসলামে মানব হত্যাকে বড় পাপ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এমনকি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা পুরো জাতিকে হত্যা করার সাথে তুলনা করা হয়েছে। মানব হত্যা জাতি হত্যারই নামান্তর। মহান আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি কাউকে (অন্যায়ভাবে) হত্যা করল, সে যেন পৃথিবীর সব মানুষকেই হত্যা করল। আর যে ব্যক্তি কারো জীবন রক্ষা করল সে যেন পৃথিবীর সব মানুষের জীবনই রক্ষা করল[21]।' (সূরা আল মায়িদাহ-৩২)

হত্যাকারীর শেষ পরিণতি হলো জাহান্নামের বিভীষিকাময় আগুন। অন্যায়ভাবে কোনো ব্যক্তিকে হত্যার পরিণাম নিশ্চিত জাহান্নাম। কুরআনে এসেছে, 'আর যে ব্যক্তি জেনে বুঝে কোনো মুমিনকে হত্যা করে, তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম। সেখানে সে চিরকাল থাকবে। তার ওপর আল্লাহর ক্রোধ ও

---

[21]sura mayida 32

লানত বর্ষিত হতে থাকবে। আল্লাহ তার জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন[22]।' (সূরা আন নিসা, আয়াত-৯৩)

দুনিয়াতেও হত্যাকারীর জন্য কিসাসের (প্রতিশোধ) বিধান রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কিসাস গ্রহণ বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, ক্রীতদাস ক্রীতদাসের বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়। অতঃপর তার ভাইয়ের তরফ থেকে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করে দেয়া হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং ভালোভাবে তাকে তা দিতে হবে। এটা তোমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে সহজ এবং বিশেষ অনুগ্রহ। এর পরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে, তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আজাব[23]।' (সূরা বাকারা, আয়াত : ১৭৮-১৭৯)

অনেকে আবার কিসাসের বিষয়টি মেনে নিতে চায় না। অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে জ্ঞানীরা! তোমরা জেনে রেখো যে, কিসাসের মধ্যে মানবগোষ্ঠীর অমরত্ব রয়েছে[24]।' (সূরা বাকারা-১৭৯)

এর মধ্যে বড় দূরদর্শিতা রয়েছে। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে যে, একজনের পরিবর্তে অপরজন নিহত হচ্ছে। অর্থাৎ দু'জন মারা যাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যদি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখা হয় তাহলে জানা যায়, এটা জীবন লাভেরই কারণ। হত্যা করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির স্বয়ং এই ধারণা হবে যে, সে যাকে হত্যা করতে যাচ্ছে তাকে হত্যা করা উচিত হবে না। কেননা, তাকেও নিহত হতে হবে। এই ভেবে সে হত্যা করা থেকে বিরত থাকবে। ফলে দু'ব্যক্তিই মৃত্যু থেকে বেঁচে যাচ্ছে। পূর্বের গ্রন্থসমূহের মধ্যেও তো মহান আল্লাহ এই কথাটি বর্ণনা করেছিলেন যে, হত্যা হত্যাকে বাধা দেয়, কিন্তু কুরআনুল হাকিমের মধ্যে অত্যন্ত বাকপটুতা ও ভাষা অলঙ্কারের সাথে এই বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর বলা হচ্ছে- 'এটা তোমাদের বেঁচে থাকার (তাকওয়া) কারণ। প্রথমত, তোমরা মহান আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে রক্ষা পাবে।

দ্বিতীয়ত, না কেউ কাউকে হত্যা করবে, আর না সে নিহত হবে। সুতরাং পৃথিবীর বুকে সর্বত্র নিরাপত্তা ও শান্তি বিরাজ করবে।

এখন আমাদের দেশে এমনভাবে হত্যা বেড়ে চলেছে যে, সামান্য ভুল বোঝাবুঝি হলেই হত্যার হুমকি দেয়। এভাবে আশঙ্কায় মানুষ হতাশাগ্রস্ত হয়। একজন মানুষকে হত্যা করে তার পুরো পরিবারকে বিপদের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিচ্ছে। তার পরিবার হয়ে যাচ্ছে নিঃস্ব, অসহায়। এভাবে মানুষ দিনের পর দিন জন নিরাপত্তা হারাচ্ছে। অথচ যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে, সেই প্রকৃত মুসলিম। রাসূলুল্লাহ সা: ইরশাদ করেন, 'খাঁটি মুসলিম হচ্ছে সে, যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে।' (বুখারি) তাই ইসলামের শিক্ষা হলো মানুষকে হত্যা না করা। বরং জীবন দান করা।
কিয়ামত দিবসে সর্বাগ্রে বিচার হবে মানব হত্যার। তারপর হবে অন্যান্য অপরাধের বিচার। রাসূল সা: বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম যে মোকদ্দমার ফায়সালা হবে, তা হলো রক্তপাত (হত্যা) সম্পর্কিত।' (বুখারি-৬৩৫৭, মুসলিম-৩১৭৮)। হত্যা একজন মানুষকে কেবল অপরাধী বানায় না বরং ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়। হাদিসে এসেছে, 'মুসলিমকে গালি দেয়া

---

[22]sura nisa 93

[23]sura bakara 178,179
[24]sura bakara 179

ফাসেকি এবং তাকে হত্যা করা কুফরি।' (বুখারি-৪৮) অতএব কোনো ব্যক্তি তার মধ্যে ঈমান থাকা অবস্থায় অন্য মুসলিম ভাইকে হত্যা করতে পারে না।

নেশা নামক মারন ফাঁদঃ আধুনিক প্রযুক্তির আরেক নতুন উদ্ভাবনার নাম হলো কতিপয় মাদক দ্রব্য।এগুলোর ব্যাবহার ভালো কাজে করার জন্য ই এগুলোর আবিস্কার। কিন্তু ভালোর পাশাপাশি এর ক্ষতির ও কমতি নেই।

মূলত কিশোর ও যুব সমাজের জন্য মাদক মারাত্মক হুমকি স্বরুপ দেখা দিচ্ছে। মাদকের বিষাক্ত ছোবল ধ্বংস করে দিচ্ছে অসংখ্য সম্ভাবনাময় জীবন। মাদকের কারণে প্রতিনিয়ত সমাজের পাপাচার, অন্যায়, বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতা বেড়েই চলেছে।

ইসলামে নেশা বা মাদককে হারাম করা হয়েছে। যে বস্তুর সেবন করলে মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে, স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ব্যাহত হয়, অশান্তি, বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় সেই নেশার ওপর ইসলাম পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। ইসলামে অসংখ্য আয়াত ও হাদীসে নেশার প্রতি নিষেধাজ্ঞার উল্লেখ রয়েছে।

মাদকের আরবি প্রতিশব্দ হচ্ছে ‘খমর’ ((خمر যার অর্থ: সমাচ্ছন্ন করা, ঢেকে দেয়া । অর্থগত দিক থেকে মিল থাকার কারণে আরবিতে মদ বা শরাবকে ‘খমর’ বলা হয়। মদ মূলত আঙ্গুর থেকে তৈরি করা হয় এছাড়াও বিভিন্ন ফল ও ফুল থেকেও নেশাজাতীয় দ্রব্য তৈরি হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَ كُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ অর্থাৎ, ‘প্রতিটি নেশাদার বস্তুই মদ আর সকল মদই হারাম’। (সহীহ মুসলিম শরীফ , মিশকাত শরীফ)।

মাদক দ্রব্য হলো এমন একটি রাসায়নিক দ্রব্য যা গ্রহণ করলে মানুষের শরীরের স্বাভাবিক ও মানসিক অবস্থার ওপর প্রভাব পড়ে এবং যা আসক্তি, তন্দ্রাচ্ছন্নতা, মেজাজ পরিবর্তন, মানসিক, আচ্ছন্নতা রক্তচাপ পরিবর্তন ইত্যাদির সৃষ্টি করে।

বর্তমান সময়ে মাদকদ্রব্য বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ধরনের হতে পারে যেমন: হিরোইন, কোকেইন, ইয়াবা, আফিম, মারিজুয়ানা, গাজা, ফেনসিডিল, বিয়ার, কেটামিন, মদ ও বিভিন্ন ধরনের ঘুমের ওষুধ থেকে শুরু করে জুতায় লাগানোর আঠা পর্যন্ত এর অন্তর্ভুক্ত। নেশার দ্রব্য বিভিন্ন ভাবে সেবন করা যায় : পান করে, ইঞ্জেকশন এর মাধ্যমে, নিশ্বাসের মাধ্যমে, শরীর কেটে ইত্যাদিভাবে ।

ইসলামে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাজিল করে মহান আল্লাহ পাক নেশা বা মাদক সম্পূর্ণভাবে হারাম করেছেন । সূরা মায়িদায় আল্লাহ পাক বলেছেন-

‘হে মুমিন বান্দাগণ! মদ, জুয়া, প্রতিমা ও লটারি এসকল ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা এসকল কাজ থেকে দূরে থাকো। যেন তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হতে পার। শয়তান তো এটাই চায় যে, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হোক এবং তোমরা আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে দূরে থাকো। সুতরাং তোমরা কি নিবৃত্ত হচ্ছো?’ (সূরা: মায়িদা, আয়াত: ৯০-৯১)

মাদকের নেশা করার পর একজন মানুষ তার স্বাভাবিক ভারসাম্য ঠিক রাখতে পারেনা। শয়তান এসময় তাকে পেয়ে বসে। নেশাগ্রস্থ অবস্থায় নেশাকারীর ঈমান ঠিক থাকে না অতএব যদি ওই অবস্থায় কেউ মৃত্যুবরণ করে তাহলে তাকে বে-ঈমান হিসেবে মরতে হবে। এবং তার স্থান হবে জাহান্নামে।

মাদক নেশার ভয়াবহতা সম্পর্কে হজরত আবূ হুরাইরা (রা.) কতৃক বর্ণিত নবী করিম (সা.) এর একটি হাদীস এসেছে যে, ‘ব্যাভিচারে লিপ্ত থাকা অবস্হায় ব্যভিচারীর ঈমান থাকেনা, মদ পান করার সময় মদ পানকারীর ঈমান থাকেনা এবং চোর চুরি করার সময় ঈমানদার থাকেনা।’ (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ্)

মাদক নেশাকারীর শাস্তি সম্পর্কে পবিত্র কোরআন ও হাদীসে অনেক বর্ণনা দেয়া আছে। একজন নেশাগ্রস্থের সম্পর্কে নবীজী (সা.) বলেন, ‘ মদ পান করে যে ব্যক্তি মাতাল হয়ে যাবে তার ৪০ দিনের নামাজ কবুল হবে না। এবং ঐ অবস্হায় মৃত্যু বরন করলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর যদি সে তাওবাহ করে আল্লাহ তার তাওবাহ কবুল করবেন, অত:পর সে পুনরায় মদ পান করে মাতাল হয়ে যায় তাহলে তার ৪০ দিনের সালাত কবুল হবেনা। অত:পর যদি সে ৪র্থ বারের মত মদ পান করে তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহর ওপরে তাকে রাদাগাতুল খাবালম্বীনাতুল খাবাল পান করানো অপরিহার্য হয়ে পরবে। তারা জিজ্ঞাসা করল: হে আল্লাহর রাসূল! রাদাগাতুল খাবালম্বীনাতুল খাবাল কি জিনিস ? রাসূল বললেন: জাহান্নামীদের শরীর থেকে নির্গত দুর্গন্ধযুক্ত নিকৃষ্ট রস।’ (ইবনু মাজাহ (৩৩৭৭), ইমাম আহমদ ও তিরমিযী)

এছাড়াও মিরাজের রাতে মহানবী (সা.) বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি দেখেছিলেন। সেখানে মদ, মাদক ও নেশা গ্রহণকারীদেরও শাস্তি দেখেছিলেন। সেখানে তিনি দেখেছিলেন যে নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিরা জাহান্নামিদের শরীর থেকে নির্গত বিষাক্ত নোংরা পুঁজ পান করছ।(সহীহ বুখারি ও মুসলিম)

মাদকের নেশার সঙ্গে সম্পর্কিত ১০ ব্যক্তির ওপর মহান আল্লার রাসূলের অভিসম্পাত রয়েছে।আর তারা হলো:(১) মদের নির্যাস যে বের করে, (২) প্রস্তুতকারক, (৩) পানকারী, (৪) যে পান করায়, (৫) আমদানীকারক, (৬) আমদানী যার জন্য করা হয়, (৭) বিক্রেতা, (৮) ক্রেতা, (৯) রপ্তানীকারক এবং (১০) লভ্যাংশ ভোগকারী।

মাদকের নেশা ইসলামে যেমন নিষিদ্ধ তেমনি আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও অনেক ক্ষতি বয়ে আনে। মাদকের প্রতি নেশাগ্রস্ততার অনেক কুফল রয়েছে যা আমাদের ব্যক্তিজীবনকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় যেমন:

(১) সুস্থ মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটায়,

(২) জ্ঞান ও স্মৃতিশক্তির লোপ করে,

(৩) হজম শক্তির হ্রাস ঘটায় এবং খাবার স্পৃহা নষ্ট করে দেয়,

(৪) স্নায়ু দূর্বল হয়ে যায়,

(৫) শারিরীক ক্ষমতা হ্রাস পায়,

(৬) চেহারার বিকৃতি ঘটায়,

(৭) কিডনির সমস্যাসহ আরো অনেক সমস্যা দেখা দেয়,

(৮) বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করে,

(৯) সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটায়,

(১০) অর্থের অপচয়,

(১১) সাংসারিক অশান্তির সৃষ্টি করে,

(১২) লিভার, হার্ট সংক্রান্ত অনেক রোগ হয়,

(১৩) হেপাটাইটিস, ফুসফুসে ক্যান্সার, স্ট্রোক, হৃদরোগ, জন্ডিস, মস্তিষ্কে ও মেরুদন্ডে রোগ হতে পারে, ইত্যাদি।একসময় ইসলামে শুরুর দিকে মদ পান জায়েয ছিল কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে তা পবিত্র কোরআনের আয়াত নাজিল করে হারাম করা হয় এবং কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়।

পরিশেষে আলোচ্য বিষয় থেকে শিক্ষা নিয়ে অন্তরে মহান আল্লাহর ভয় এবং রাসূল (সা.) প্রেম জাগ্রত করে যাবতীয় হারাম বস্তু ও নেশাদার বস্তু থেকে দূরে থাকি, যথাযথভাবে ইসলামী আদর্শ গ্রহণ করি এই হোক আমাদের শপথ।

প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারঃ

নিশ্চয়ই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃজনে ও রাত-দিনের পালাক্রমে আগমন ও প্রস্থানে বহু নিদর্শন আছে ঐসব বুদ্ধিমানের জন্য যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে (সর্বাবস্থায়) আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে (এবং তা লক্ষ্য করে বলে ওঠে) হে আমাদের

প্রতিপালক! আপনি এসব উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি। আপনি অনর্থক কাজ থেকে পবিত্র *(আলে ইমরান ৩/১৯০-১৯১)*।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন আসমান-যমীন, আগুন-পানি, মাটি, বাতাস ইত্যাদি ছাড়াও লাখ লাখ মাখলূক। দুনিয়াতে যা কিছু আমরা মানুষের আবিষ্কার বলে মনে করি সেগুলিও মূলতঃ আল্লাহ তা'আলারই সৃষ্টি। কারণ তিনিই একমাত্র স্রষ্টা। তিনি ছাড়া আর কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। তিনিই কালের স্রষ্টা, কালের সব নবাবিষ্কারও তাঁরই সৃষ্টির সহায়তায় সৃষ্ট। আল্লাহ বলেন, ' هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا তিনিই সেই সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছু' *(বাক্বারাহ ২/২৯)*। সুতরাং বর্তমান বিশ্বে যত সব আবিষ্কার ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সবই মহান আল্লাহর সৃষ্টিকে কেন্দ্র করেই সৃষ্ট।

উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন যে, মানুষ জগতের যা কিছু দ্বারা উপকার লাভ করে তা সবই আল্লাহ তা'আলার দান। এর প্রত্যেকটি জিনিস আল্লাহ তা'আলার তাওহীদের নিদর্শন। এতদসত্ত্বেও তার সঙ্গে কুফরী কর্মপন্থা অবলম্বন করা কত বড়ই না অকৃতজ্ঞতা!

এখন প্রযুক্তির যুগ। প্রযুক্তির কল্যাণে গোটা বিশ্বই এখন একটি গ্রামে পরিণত হয়েছে। মুহূর্তের মাঝে এক দেশের খবর চলে আসে অন্য দেশে। হাযার হাযার মাইল দূরে অবস্থানরত মানুষের সাথে কথা বলা যায় অনায়াসে। পৃথিবীর এই তাবৎ আবিষ্কার, প্রযুক্তির এই সব উন্নয়ন সবই ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য মহান আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ নে'মত। যার শুকরিয়া আদায় করা প্রতিটি বান্দার জন্য আবশ্যক। কেননা আল্লাহ বলেন, ' لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে বেশী বেশী করে দেয়। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তাহ'লে (মনে রেখ) নিশ্চয়ই আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর' *(ইবরাহীম ১৪/৭)*।

শুকরিয়ার সর্বনিম্ন স্তর হ'ল, আল্লাহর নে'মতকে সঠিক স্থানে ও সঠিকভাবে ব্যবহার করা এবং আল্লাহর নাফরমানিতে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা।

এমন কোন প্রযুক্তি পণ্য বা প্রযুক্তিগত উন্নয়ন নেই, যেটা ইসলামের খেদমতে ব্যবহারযোগ্য নয়। তবে স্মর্তব্য যে, প্রতিটি জিনিসকে ভালো কাজেও ব্যবহার করা যায়, আবার মন্দ কাজেও ব্যবহার করা যায়। দোষ কিন্তু জিনিসের বা প্রযুক্তির নয়। বরং এখানে ব্যবহারকারী মূলতঃ দায়ী। যেমন টেলিভিশনের মাধ্যমে মন্দ ছবিও দেখ যায়, আবার সারাদিন ইসলামিক অনুষ্ঠানও দেখা যায়। লক্ষণীয় যে, প্রযুক্তিকে আমরা কোন কাজে ব্যবহার করছি সেটাই বিবেচ্য বিষয়। আমরা যদি প্রযুক্তিকে ইসলাম প্রচারের কাজে লাগাই তাহ'লে সব ধরনের প্রযুক্তিই কল্যাণের মাধ্যম হবে। আর যদি এই কথা বলে পিছিয়ে থাকি যে, এগুলো ব্যবহার করা হারাম। তাহ'লে এগুলোর সুফল থেকে জাতি বঞ্চিত হবে। সব নবী-রাসূলই তাদের যামানায় তৎকালীন প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়েছেন এবং নিজস্ব ধর্মের প্রচার-প্রসার

করেছেন। তাঁরা প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার করেছেন। আমরাও যদি প্রযুক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করি তাহ'লে তা হবে ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য কল্যাণকর।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি :

ইসলামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিদ্যমান। যেমন আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ-

'তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। অতঃপর শুক্রবিন্দু হতে, অতঃপর জমাট রক্ত হতে, অতঃপর তোমাদেরকে বের করে দেন শিশুরূপে। অতঃপর তোমরা পৌঁছে যাও যৌবনে। অতঃপর বার্ধক্যে। তোমাদের কারু কারু এর পূর্বেই মৃত্যু ঘটে এবং কেউ কেউ নির্ধারিত আয়ুষ্কাল পর্যন্ত পৌঁছে যাও। যাতে তোমরা অনুধাবন কর।' *(গাফির/মুমিন ৪০/৬৭)*।

এই আয়াতটির মধ্যে যে বিপুল পরিমাণের বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং চিন্তার খোরাক আছে তা যদি বাদও দেই, শুধু আয়াতের সমাপ্তিটি 'যাতে তোমরা অনুধাবন কর' এটুকু লক্ষ্য করি, তাহ'লে দেখতে পাব যে, কিভাবে মানুষ মাত্র একফোঁটা তরল পানি থেকে পূর্ণাঙ্গ শিশু হয়ে বের হয়ে একসময় বড় হয়ে শক্ত-সমর্থ মানুষে পরিণত হয়, তারপর একদিন বৃদ্ধ হয়ে মারা যায়। ঠিক একইভাবে বিচার-বুদ্ধি ব্যবহার করাটাও মানুষ হবার একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ।

এই আয়াতের মমার্থ উপলব্ধি করে, যুগে যুগে মুসলিম বিজ্ঞানীগণ জ্ঞানের চর্চা করেন এবং সেই মধ্যযুগে জ্ঞানের আলো সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ে ইউরোপ ছিল অজপাড়াগাঁ। আর মুসলিম স্পেন ছিল প্রযুক্তির

ব্যবহারে শীর্ষে। মুসলিম বিজ্ঞানীগণ ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উদ্ভাবক। যেমন রসায়ন, চিকিৎসা, ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতির উদ্ভাবক ছিলেন মুসলিম বিজ্ঞানীগণই। রসায়ন বিজ্ঞানের জনক জাবির বিন হাইয়ান, চিকিৎসা বিজ্ঞানে আল-রাযী ও ইবনে সীনা, ফলিত পদার্থ বিজ্ঞানে আল-ফারগানী, সমাজবিজ্ঞানে ইবনে খালদূন প্রমুখের নাম জগদ্বিখ্যাত হয়ে আছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়নের ক্ষেত্রে আকল বা বিচার-বুদ্ধি ও ফিকর বা চিন্তা-চেতনার গুরুত্ব অত্যধিক। এ সম্পর্কে আল-কুরআনের নির্দেশনা এসেছে যে, أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُوْنَ- 'তারা কি তাদের অন্তরে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন সত্য সহকারে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য? কিন্তু অনেক মানুষ তাদের পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতে অবিশ্বাসী' *(রূম ৩০/৮)*।

মানুষ যদি আল্লাহর সৃষ্টির এই নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা করে তাহ'লে বুঝতে পারবে যে, গোটা বিশ্ব সৃষ্টি এমনিতেই হয়নি। এর পিছনে এক বিরাট উদ্দেশ্য আছে এবং সবকিছুই একটি চরম পরিণতির দিকে যাচ্ছে। একসময় তাকে আল্লাহর সামনে হাযির হয়ে জবাব দিতেই হবে। যা মানুষকে আল্লাহমুখী করে। এজন্যই আল্লাহ কুরআনে ৪৯ বার 'আকল' ও ১৮ বার 'ফিকর' উল্লেখ করেছেন।

এছাড়াও আল্লাহ তাঁর নিদর্শনসমূহ দেখতে সারাবিশ্ব পরিভ্রমণের নির্দেশ দিয়ে বলেন, قُلْ سِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ- 'বল, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর। অতঃপর দেখ কিভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন। অতঃপর আল্লাহ পরবর্তী সৃষ্টি করবেন' *(আনকাবূত ২৯/২০)*।

বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম প্রধান উপায় হ'ল পড়া। ইসলামের প্রথম নির্দেশ হ'ল 'পড়'। এমনকি সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াতেই মানবসৃষ্টির উপাদান 'আলাক্ব'-এর মাঝেই বিজ্ঞানের অনেক মর্ম লুকিয়ে আছে। ইসলাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারকে কখনই নিরুৎসাহিত করে না। বরং এর সঠিক ও সুন্দর ব্যবহারকে উৎসাহিত করে। মদীনায় নবী করীম (ছাঃ)-এর জীবনে এরকম অনেক প্রযুক্তিগত ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধে যে পারসিক কৌশল ব্যবহার করা হয় তা ছিল আরবদের কাছে অপ্রচলিত প্রযুক্তি। এমনিভাবে অন্য যুদ্ধগুলোতেও সামরিক দিক দিয়ে অনেক উন্নত রণকৌশলের প্রয়োগ দেখা যায়। ইসলামী সমাজের বিভিন্ন নীতিমালা যে কতটা বিজ্ঞানসম্মত তা আজ সুপ্রমাণিত। মহানবী (ছাঃ)-এর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মূলনীতি ছিল সর্বাধুনিক ও সর্বকালীন।

তবে প্রতিটি জিনিসেরই ভালো-খারাপ দিক রয়েছে। মানুষ চাইলে তাকে যে কোন পথে ব্যবহার করতে পারে। প্রযুক্তিও তার ব্যতিক্রম নয়। এটিকে যেমন ইসলামের খেদমতে ব্যবহার করা সম্ভব। তেমনি খারাপ পথেও তা ব্যবহার করা যায়। লক্ষণীয় যে, আমরা প্রযুক্তিকে কোন কাজে ব্যবহার করছি সেটাই বিবেচ্য বিষয়। আমরা যদি প্রযুক্তিকে ইসলাম প্রচারের কাজে লাগাই তাহ'লে সব ধরনের প্রযুক্তিই কল্যাণের মাধ্যম হবে।

মানবতার কল্যাণে বিজ্ঞানের অবদান অনস্বীকার্য। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা নিঃসন্দেহে মানুষের জীবনযাপনকে সহজ ও সাবলীল করেছে। ইসলামের সাথে বিজ্ঞানের কোন বিরোধ নেই। তবে বিজ্ঞান পরিবর্তনশীল, ইসলাম চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয়। কিন্তু বর্তমানে প্রযুক্তির অপব্যবহারের কারণে সঠিক ব্যবহার ও এর সুফল আড়ালে পড়ে যাচ্ছে। প্রযুক্তির অপব্যবহারে অনেকের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ছে। এর কবল থেকে পরিত্রাণের আশাও অকল্পনীয় বৈ কি। প্রযুক্তির এই নে'মতগুলো আজ আযাবে পরিণত হচ্ছে। এ বিষয়ে নিম্নে আলোকপাত করা হ'ল।-

প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের গুরুত্ব :

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রযুক্তির ব্যবহার সর্বত্র। এর অবদানকে যেমন অস্বীকার করা যাবে না, তেমনি এটার অপব্যবহারের কথা বলে এটাকে পরিত্যাগ করারও কোন উপায় নেই। বরং আমাদেরকে

এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বস্ততঃ প্রযুক্তির যথার্থ ব্যবহারই আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখতে পারে।

সব নবী-রাসূলই তাদের যুগে তৎকালীন প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়েছিলেন এবং মহান সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলার বিধান প্রচার-প্রসার করেছেন। উম্মতকে প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার শিখিয়েছেন। মহান আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছিয়েছেন। মূসা (আঃ)-এর সময় জাদুর প্রভাব ছিল অধিক। মূসা (আঃ) সে যুগের প্রেক্ষাপটে আল্লাহ প্রদত্ত মুজেযা ব্যবহার করে ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের নিকট দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। ফলে অসংখ্য জাদুকর আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল। ঈসা (আঃ)-এর সময়ে চিকিৎসাবিদ্যার প্রচলন ছিল বেশী। তিনি তাই আল্লাহ প্রদত্ত চিকিৎসাবিদ্যার ব্যবহারের মাধ্যমে দাওয়াত দিয়েছেন। মৃতকে আল্লাহর হুকুমে জীবিত করে দেখানোর মাধ্যমে দাওয়াতী কাজ করেছেন *(মায়েদাহ ৫/১১০)*।

সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে আল্লাহ সারা জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছিলেন। তিনি এ ধরণীতে এসে মুশরিক, ইহুদী সহ সবাইকে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। দাওয়াত দানে তিনি তৎকালীন প্রযুক্তি ব্যবহার করেছেন। ছাফা পাহাড়ে উঠে তিনি মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। সে যুগে সাহিত্যের প্রভাব ছিল বেশী। তিনি উচ্চাঙ্গের আরবী সাহিত্যের ব্যবহার করেও মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন।

একটি দেশ উন্নত রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করার প্রধান চালিকাশক্তি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আবিষ্কারে ও ব্যবহারে অগ্রসরতা। যে জাতি যত বেশী উন্নত সে জাতি তত বেশী শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও প্রযুক্তি ব্যবহারে পারদর্শী। ইসলাম প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান চর্চাকে গুরুত্ব দিয়েছে। প্রয়োজনে বিদেশ থেকে প্রযুক্তি শিক্ষালাভ করা যেতে পারে। কিন্তু স্বনির্ভর হওয়ার শক্তি পঙ্গু করে পরজাতির মুখাপেক্ষী থাকা গ্রহণযোগ্য নয়। উন্নয়নের একমাত্র সোপান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে স্বনির্ভর হওয়া প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য আবশ্যক।

প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার:

বিজ্ঞানের উন্নতির এই যুগে দাওয়াতের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অল্প সময়ে, অল্প কষ্টে অসংখ্য মানুষের কাছে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া যায়। আধুনিক মাধ্যমগুলোতে ইসলামের ছহীহ আক্বীদার মানুষ কম আসায় এক্ষেত্রে সুযোগ নিচ্ছে বিভিন্ন ভ্রান্ত দল ও গোষ্ঠী। তাদের থেকে তরুণ প্রজন্মকে বাঁচাতে আধুনিক মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে সঠিক ইসলামকে মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তির বিভিন্ন মাধ্যমকে কিভাবে সঠিক পথে পরিচালনা করা যায় এবং কিভাবে ইসলাম প্রচারে ব্যবহার করা যায় তা নিচে উল্লেখ করা হ'ল।-

টেলিভিশন মিডিয়া : ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার একক হ'ল পরিবার। সেই পরিবারের অন্যতম বিনোদন মাধ্যম হ'ল টেলিভিশন। এ মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের গুরুত্ব অপরিসীম। এই মাধ্যমের অপব্যবহারগুলো সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করার পাশাপাশি একে ইসলাম প্রচারের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

ইসলামী বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিভিন্ন চ্যানেলে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করতে ইসলামী নেতৃবৃন্দের একজোট হয়ে কাজ করলে তা সহজ হবে।

রেডিও : হাতের কাছে সর্বক্ষণ সহজলভ্য মোবাইলের কল্যাণে অধুনা এই মাধ্যমের ব্যাপ্তি বেড়েছে। দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, এটি এমন একটি মাধ্যম যেটাতে ইসলামী কোন চ্যানেল নেই। অথচ অন্যান্য মিডিয়ার তুলনায় এটার খরচ কম হ'লেও এর ব্যাপ্তি বা প্রভাব অনেক বেশী। অত্যন্ত কম খরচে অল্প সীমানায় (range) সম্প্রচার করতে চাইলে কমিউনিটি রেডিও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ ব্যাপারে মুসলিমদের ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক উদ্যোগই পারে এ মাধ্যম ব্যবহার করে ইসলাম প্রচার করতে।

প্রিন্ট মিডিয়া : সমাজের পরিবর্তনে ও সমাজে ভালো কিছু প্রচলনের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা স্থায়ী ভূমিকা রাখতে পারে প্রিন্ট মিডিয়া। উপমহাদেশের মুসলিম সাংবাদিকতার জনক মওলানা আকরম খাঁ হ'লেও তাঁর উত্তরসূরীরা এই মাধ্যমে প্রায় অনুপস্থিত। এ মাধ্যমে এখন বামপন্থী ও সেক্যুলারদের প্রাধান্য। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখে এবং ইসলামের প্রতি সহানুভূতিশীল দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক প্রকাশনা নেই বললেই চলে। এই সুযোগে দেশে বামপন্থী ও সেক্যুলার মতবাদ মানুষের মন-মগজে প্রবেশ করছে। আমাদের মুসলিম শিশুদের মাঝেও এই চিন্তা-ভাবনা প্রবেশ করছে। এর ফলে আমরা শঙ্কিত যে, আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম মুসলিম থাকবে কি-না! তাই মিডিয়ায় এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে ইসলামের কাজে লাগাতে চাই সমন্বিত উদ্যোগ। বিত্তবান মুসলিমদের এগিয়ে আসার পাশাপাশি মেধাবীদেরও এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে ইসলামের কাজে লাগাতে হবে। সেই সাথে শিশুদের ইসলামমুখী করতে শিশুতোষ পত্রিকা প্রকাশ করাতে হবে এবং তা সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে।

কম্পিউটার : বর্তমান বিশ্বে কম্পিউটার এমন এক প্রযুক্তির নাম পৃথিবীর সবকিছুতেই যার ছোঁয়া অপরিহার্য। এর অবদান অনস্বীকার্য। পৃথিবীর সব যন্ত্রই বর্তমানে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত তথা কম্পিউটারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্যে পরিচালিত। লেখাপড়া, সাহিত্যচর্চা, সাহিত্য-কলা সবকিছুতেই কম্পিউটার প্রসারিত করেছে তার সাহায্যের হাত। উন্নত বিশ্বে কৃষি, বাণিজ্য, চাকরি থেকে নিয়ে হেন কোন পেশা নেই যাতে কম্পিউটারের সাহায্য নেয়া হয় না। এই মাধ্যমকে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে অনেক সহজে ও সফলতার সাহায্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। কম্পিউটারের মাধ্যমে আজ কুরআন, হাদীছ, বিভিন্ন ইসলামী রেফারেন্স গ্রন্থ পড়া ও সংরক্ষণ করা, ভিডিও দেখা, অডিও শোনা প্রভৃতি অনেক সহজতর হয়েছে। আগে কুরআনের আয়াত বা হাদীছের ইবারত সংগ্রহ করা অনেক কঠিন ছিল। আজ তা অনেক সহজতর হয়েছে। কুরআন-হাদীছ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সফটওয়্যার রয়েছে। এগুলোতে সহজেই একটি সূরা থেকে অন্য সূরাতে গমন করা যায়। বিভিন্ন আয়াত বের করা যায় বিভিন্ন শব্দ দিয়েও আয়াত বের করা যায়। হাদীছের ক্ষেত্রেও এরকম সফটওয়্যার বিদ্যমান। বাংলা ভাষায়ও কুরআন-হাদীছের অনেক ওয়েব, সফটওয়্যার, অ্যাপ বিদ্যমান। এগুলোর যথাযথ প্রচার ও সহযোগিতায় এগিয়ে আসা আমাদের কর্তব্য।

কুরআন, হাদীছ ও ইসলামী রেফারেন্স-এর ক্ষেত্রে 'মাকতাবা শামেলা' সফটওয়্যার অসাধারণ। এতে বিভিন্ন বিষয়ের হাযার হাযার গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা মওজুদ রয়েছে। আধুনিক যুগে ইসলামী গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এর ব্যবহার জানা আবশ্যক।

ওয়েব মিডিয়া : ওয়েব মিডিয়ায় মুসলমানদের অবস্থান খুব দুর্বল। বিশেষ করে নৈতিকতার চর্চা এখানে খুবই নগণ্য। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা যায়, অমুসলিম ও ইহুদীদের সাইট মুসলমানদের সাইটের তুলনায় ১২০০ গুণ বেশী। অশ্লীলতা ও নীল ছবির সয়লাব এত বেশী যে অল্প কিছু মুসলিম সাইটের অবস্থান সে তুলনায় অপ্রতুল। বাংলা ভাষায়ও ইসলামের উপর ওয়েবসাইটের সংখ্যা অতি নগণ্য। যেগুলো রয়েছে তার মানও অনেক কম। অনেক ওয়েবসাইট নিয়মিত আপডেট হয় না। ওয়েব মিডিয়ার অন্যতম উপাদান অনলাইন নিউজ-এর ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারাসম্পন্ন পোর্টাল এর অত্যধিক অভাব পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া ইসলাম বিষয়ে বিভিন্ন ব্লগ, ওয়েবসাইট প্রভৃতিরও সংখ্যা অনেক কম। এগুলোর প্রচার-প্রসারে আরো অনেক ওয়েবসাইট, ব্লগ গঠনে এগিয়ে আসার পাশাপাশি নতুন নতুন আইডিয়া নিয়ে কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে।

অনলাইন মিডিয়ায় বিভিন্ন বইয়ের পিডিএফ, মোবি, ইপাব প্রভৃতি প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা ক্রমাগত বাড়ছে। যেহেতু অনৈসলামী শক্তি বিভিন্ন সময়ে ওয়েবে ইসলাম প্রচারকারী সাইটকে বন্ধ করে দেয়ার অপপ্রয়াস চালায়, সেক্ষেত্রে সবসময় এগুলোর ব্যাকআপ রেখে কাজ করা আবশ্যক। ওয়েবে শুধু আর্টিকেল প্রকাশই নয়, ইসলামী নীতিমালার বিষয়গুলোর উপর অডিও, ভিডিও, প্রেজেন্টেশন প্রভৃতি প্রকাশ ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনতে পারে। বিভিন্ন বিষয়ের উপর উইকিপিডিয়া একটি মুক্ত গ্রন্থাগার। ইসলামী বিষয়ের উপর আর্টিকেলগুলো এই সাইটে সবচেয়ে অবহেলিত। তরুণ সমাজের উচিত এটিকে সমৃদ্ধকরণে এগিয়ে আসা।

ই-মেইল : ই-মেইলের মাধ্যমে অসংখ্য মানুষের কাছে ইসলামের বাণী মুহূর্তেই পৌঁছানো যায়। যত বড় লেখাই হোক না কেন তা লিখে মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া যায়। ই-মেইল এ গ্রুপ সৃষ্টি করার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে গ্রুপ মেসেজ আদান-প্রদান করা যায়। জিমেইলের ফাইল হোস্টিং সার্ভিস গুগল ড্রাইভের মাধ্যমে ফাইল সংরক্ষণ করা যায়। এমনকি বিভিন্ন ডকুমেন্টকে Ocr করে word ফরম্যাটে রূপ দেয়া যায়।

ফেসবুক সহ অন্যান্য স্যোশাল মিডিয়া : স্যোশাল মিডিয়াগুলো যদিও ওয়েব মিডিয়ার অন্তর্ভুক্ত, তবুও এর গুরুত্ব ও পরিব্যাপ্তি অনেক হওয়ায় তার আলাদা আলোচনা গুরুত্বের দাবী রাখে। বর্তমানে শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত এ মিডিয়া আসক্ত। এ মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলাম প্রচার অনেক সহজ এবং অনেক দ্রুত গতিতে তা ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এ মিডিয়ার সঠিক ব্যবহারের উদাহরণ অপব্যবহারের তুলনায় অনেক কম। ফেসবুকে লেখা, ছবি, ভিডিও, নোট (বড় লেখা) প্রকাশ করে দ্বীনে হকের দাওয়াতের কাজ করা যায়। এক্ষেত্রে দাওয়াতের পাশাপাশি অনৈসলামী মতবাদকে খন্ডনও করা যায়। তবে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে সৌজন্য, শালীনতা, মাধুর্যতা বজায় রাখা আবশ্যক। সবসময়

বিরোধিতামূলক বা খন্ডনমূলক প্রচার নয়, বরং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দাওয়াত দেওয়া অনেক বেশী কার্যকর। দাওয়াতের ক্ষেত্রে ইসলামী মূলনীতি অনুসরণ করে সঠিক তথ্য-প্রমাণসহ আলোচনা দাওয়াতকে বেগবান করবে বলে আশা করা যায়। এছাড়াও অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া যেমন টুইটার, বেশতো, উস্মাহল্যান্ড, লিংকডইন, গুগল প্লাস, ইন্সট্রাগ্রামেও ইসলাম বিষয় লেখা, ছবি পোস্ট করা সময়ের দাবী।

মোবাইল : আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক নব আবিষ্কার হ'ল মোবাইল ফোন। ধনী-দরিদ্র, রিক্সাচালক-ভ্যানচালক, নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, শিশু-কিশোর সকলের হাতেই এখন মোবাইল। মোবাইল ফোন যেন আজকাল জীবনের একটি আবশ্যিক অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এটা মানুষের জীবনকে করেছে গতিময়। আগের যামানায় যে কাজে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হ'ত, বর্তমানে তা মুহূর্তের মধ্যেই হয়ে যায়। এদিকে লক্ষ্য করলে মোবাইল অত্যন্ত যরূরী একটি জিনিস। কিন্তু এর অপব্যবহারও কম নয়! মোবাইল এখন শুধু দূর-আলাপনী যন্ত্রই নয়, এটি এখন মিনি কম্পিউটারের রূপ ধারণ করেছে। ফলে এর বহুমুখী ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। মোবাইল সঠিকভাবে ব্যবহার করে এটিকে দাওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা যায়। বিশেষ করে স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে ইসলামের অনেক বিষয় জানা, মেনে চলা সুবিধাজনক।

বর্তমানে অনেক সহজেই কুরআন-হাদীছের বাণীগুলো পড়া ও সার্চ দেয়ার সুযোগ রয়েছে। কুরআন ও হাদীছের এই সংকলনগুলো বাংলায় সহজলভ্য। এখন সহজেই ছালাতের সময়সূচী, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত প্রভৃতি জানা যায়। স্মার্টফোনের মাধ্যমে ইসলামী লেকচার, গান, টিউটোরিয়াল-এর অডিও-ভিডিও শোনা ও দেখা যায়। একটি মাত্র ছোট্ট মেমোরীতে অসংখ্য বক্তব্য ধারণ করা যায়। সেই সাথে অতি সহজেই তা অন্যের কাছে পৌঁছিয়ে প্রচার করা যায়। অ্যান্ড্রয়েড ফোনের অ্যাপগুলোর মাধ্যমে ইসলাম চর্চা অনেক সহজ হয়েছে। ইসলাম বিষয়ক অ্যাপগুলোতে কুরআনের বিভিন্ন অনুবাদ, হাদীছের গ্রন্থ, ফাতাওয়ার কিতাব, ছালাতের সময়সূচী, দৈনন্দিন জীবনের দো'আ, তাফসীর, মাসআলা-মাসায়েল প্রভৃতি বিষয় রয়েছে। এগুলোর মধ্যে বাংলা ভাষায় হিসনুল মুসলিম অ্যাপ, হাদীসবিডি অ্যাপ, আই হাদীস, বাংলা কুরআন প্রো প্রভৃতি অন্যতম। এসবের মাধ্যমে ইসলামী জ্ঞানার্জন করা সহজ হয়েছে। বিভিন্ন কাজের ফাঁকে, ভ্রমণে ও অবসর সময়ে এক ক্লিকেই এসব পড়া যায়। শুধু পড়াই নয়, অডিও ডাউনলোডের মাধ্যমে বিখ্যাত ক্বারীদের তেলাওয়াত শুনা এখন অনেক সহজ হয়েছে। অ্যান্ড্রয়েড ফোনের মাধ্যমে পিডিএফ, ইপাব, মোবি প্রভৃতি বিভিন্ন ফরম্যাটের পিডিএফ পড়া যায়। ইসলামের অসংখ্য বিষয়ে বর্তমানে পিডিএফ বিদ্যমান। হাতের কাছেই এসব রয়েছে, অথচ এসব উপকারী বিষয়কে পরিত্যাগ করে আমরা শয়তানী ওয়াসওয়াসায় পড়ে অনৈসলামিক বিষয়ে আগ্রহী হচ্ছি। ইসলামী বিষয়গুলো অন্যের মাঝে প্রচলনের জন্যে আমাদের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। এসব ধর্মীয় বই, অডিও, ভিডিও লেকচারগুলো অন্যের মাঝে বিভিন্ন মাধ্যমে (shareit, bluetooth, anyshare) প্রচার করা যায়। এসব সিডি বা ডিভিডিতে কপি করেও প্রচার করা যায়।

নিজেরাও বিভিন্ন দুর্লভ বইগুলো camscanner অ্যাপ দিয়ে মোবাইলের ক্যামেরাকে কাজে লাগিয়ে স্ক্যান করে পিডিএফ আকারে সংরক্ষণ করতে পারি। উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বাংলাদেশে অ্যান্ড্রয়েড ফোনের প্রচলন অনেক বেশী। উন্নত বিশ্বে বা আমাদের দেশের বিত্তবানরা আইফোন বা আইপ্যাড ব্যবহার করেন। কিন্তু এই অপারেটিং সিস্টেমে ইসলামিক অ্যাপ-এর সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। প্রযুক্তিবিদদের এই মাধ্যমে এগিয়ে আসার জন্য উৎসাহিত করা প্রয়োজন। বাংলা ভাষায় ইসলামিক অ্যাপগুলোর অধিকাংশই তৈরী হচ্ছে ব্যক্তিগত উদ্যোগে। এসব বিষয় সাংগঠনিক বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হ'লে এর গতিময়তা বৃদ্ধি পাবে। আলেম সমাজের এসব ক্ষুদে উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা করার পাশাপাশি সামষ্টিকভাবে কাজ করার উদ্যোগ নিতে হবে। বিত্তবানদেরও এসব উদ্যোক্তাদের আর্থিকভাবে সহযোগিতা করা নিজের ঈমানী দায়িত্ব মনে করা উচিত। আইফোনে বই পড়ার অন্যতম ফরম্যাট ইপাব (Epub)। এই ফরম্যাটে কোন বাংলা ইসলামী বই নেই। যা দুঃখজনক। এই ফরম্যাট নিয়ে কাজ করার জন্য তরুণ সমাজের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

ইউটিউব *:* মানব মনে দাগ কাটার ক্ষেত্রে দেখা ও শোনার প্রভাব বেশী। এজন্যই মাল্টিমিডিয়ার প্রয়োগ অনেক বেশী প্রয়োজন। ভিডিও প্রকাশ করে তা প্রচার করলে দাওয়াতের প্রসার অনেক বৃদ্ধি পায়। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত, তাফসীর, বিষয়ভিত্তিক আলোচনা, ইসলামী হামদ, না'ত প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। এসব রেকর্ড করে ইউটিউব, ডেইলীমোশন, ভিমিও প্রভৃতি সাইটে আপলোড করে প্রচার করা যেতে পারে। বড় বড় ভিডিওর তুলনায় ছোট ছোট প্রশ্নোত্তর বা ভিডিওর প্রভাব অনেক বেশী। শিশুদের আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য অনুমোদনযোগ্য কার্টুনও প্রকাশ করা যেতে পারে। এছাড়া শিশুদের জন্য ছড়া, বিভিন্ন ইসলামী গল্প কথকের মাধ্যমে ভিডিও করে প্রকাশ করলে তা শিশুদের মনোজগতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারে আলেমদের ভূমিকা :

তথ্য ও প্রযুক্তি মানুষের জীবন ও তার উন্নয়নে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। মানুষের জীবন প্রবাহকে বেগবান করেছে। আর ইসলাম মানুষের জন্য যে কোন কল্যাণকর জিনিসের সঠিক ব্যবহার অনুমোদন করে। তাই তথ্য ও প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারে ইসলামের কোন আপত্তি নেই। তথ্য ও প্রযুক্তির ভুল ব্যবহার হচ্ছে। কোন জিনিসের ভুল ব্যবহার হ'লে তা নিষিদ্ধ হয়ে যায় না। বরং ভুল ব্যবহার বন্ধ করতে হয়। এক্ষেত্রে আমাদের আলেম সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। তাদের দায়িত্ব মানুষকে প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার শেখানো। বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তি অর্থাৎ ইন্টারনেট ব্যবহার করে ইসলামের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে তার জবাব আলেমদের পক্ষ থেকেই আসা উচিত। ইসলামের নামে অসংখ্য নতুন নতুন ফিৎনা, বিভ্রান্ত মতবাদের প্রতিবাদ ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে প্রচার করার দায়িত্ব আলেম সমাজের উপরই বর্তায়। সাপ্তাহিক জুম'আর খুৎবায় প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারে কি করণীয় সে সম্পর্কে আলোচনা করা যরূরী। প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধে দুর্বল ঈমানদার ব্যক্তি যতটা তৎপর, অধিকতর

ঈমানের অধিকারী আলেম সমাজ তার চেয়ে বেশী তৎপর হবেন এটা আমাদের একান্ত কামনা। ইসলামের সঠিক দিক বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরার জন্য ইন্টারনেট, টিভি, ইলেক্ট্রনিক ও অন্যান্য মিডিয়া ব্যবহার করা নাজায়েয বলে ঘোষণা করা 'মাথা ব্যথা হ'লে মাথা কেটে ফেলার' নামান্তর।

প্রযুক্তির সহজ ব্যবহারের সুযোগ নিয়ে ইসলাম বিরোধীরা অনলাইনে নির্জলা মিথ্যা ছড়িয়ে দিচ্ছে। অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, নগ্নতাকে উসকে দিচ্ছে। নাস্তিকতার প্রচার ও ধর্মে অযথা অবিশ্বাস তৈরি করছে। আধুনিক জাহেলিয়াতের এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে ইসলামের প্রকৃত বার্তা মানুষের কাছে তুলে ধরার দায়িত্ব আলেম সমাজের। মানবজীবনের জন্য অতীব যরূরী আমলগুলো তথ্যসূত্রসহ তুলে ধরার মাধ্যমে ইসলামের বাস্তব অনুশীলনের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করা যেতে পারে।

আরবের আলেমরা ফেসবুক ব্যবহার করে ইসলামের দাওয়াতের ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। লাখ লাখ মানুষ তাদের পেইজে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে লেখা প্রবন্ধগুলো পাঠ করছে। এক্ষেত্রে আমাদের আলেমরা ফেসবুককে দাওয়াতের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে ইসলামের প্রচার-প্রসারে ভূমিকা পালন করতে পারেন। কুরআনের সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলো যে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা প্রচারে আলেমদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের আলেম সমাজেরই দায়িত্ব প্রযুক্তির এই দিকহারা জাহাজের পাল টেনে ধরার। সেই সাথে মানুষকে তার সঠিক ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া। ইসলামের খেদমতে প্রযুক্তিকে কিভাবে আরও শক্তিশালী করা যায় তা নিয়ে কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করা যরূরী। কারণ এখন মানুষ প্রযুক্তিনির্ভর। অফিস-আদালত, বই-পুস্তক, দোকান-পাঠ সবই এখন হাতের মুঠোয়। কিন্তু প্রযুক্তির এই উৎকর্ষতা যেন আমাদের ধ্বংসের কারণ না হয়। আল্লাহর এই অমূল্য নে'মতগুলো যাতে তাঁর নাফরমানীতে ব্যবহার না হয়, সে ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং এই প্রযুক্তিকে আল্লাহর নির্দেশ মত ব্যবহারের উপযোগী করা আলেমদেরই দায়িত্ব।

আল্লাহ বলেন, 'إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً- আমি পৃথিবীর সবকিছুকে পৃথিবীর জন্য শোভা করেছি, যাতে লোকদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে ভালো কাজ করে' *(কাহফ ১৮/৭)*।

শেষকথা :

আল্লাহ তা'আলার প্রতিটি সৃষ্টির উদ্দেশ্য থাকে। যা আমাদের জন্য কল্যানকর। কিন্তু মানব সৃষ্টি প্রতিটি বস্তুর ই ভালো ও খারাপ উভয় দিক রয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের বিবেক, জ্ঞান, বুদ্ধি দান করেছেন। ইসলাম কে পূর্নাঙ্গ জীব ব্যাবস্থা হিসেবে গরে তুলেছেন। এখন আমাদের দায়িত্ব আমাদের প্রতিটি কাজ করার আগে বিবেক বুদ্ধি কে কাজে লাগিয়ে হাদিস কোরআনের আলোকে কাজটির ভালোমন্দ বিবেচনা করে নেয়া।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দাওয়াতের পদ্ধতি এক দিকে যুগোপযোগী ও উন্নতমানের হওয়া দরকার। অন্য দিকে সমকালীন বাতিল শক্তির মোকাবেলা করার মত যোগ্যতা, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগের সক্ষমতাও থাকা প্রয়োজন। সর্বসাধারণের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতে উপরোক্ত মাধ্যমগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা দরকার।

তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষতার এই যুগে দাঈ ইলাল্লাহ তথা আল্লাহর পথে আহবানকারীদের জন্য তাওহীদের দাওয়াত বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়ার অপার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিতে হবে। ইসলামের অপার সৌন্দর্য সর্বসাধারণের কাছে তুলে ধরতে হবে। জাহেলিয়াতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে সর্বত্র পৌঁছে দিতে হবে কুরআনের আলো। আর সে প্রচেষ্টায় সবারই অংশগ্রহণ প্রয়োজন। ইসলামের দাওয়াত বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন!

আমেনা বাতুল রুম্পা
ID. NO- 20102221
Batch No. 201
IOM. Islamic Online Madrasha
29.11.2022

o~o~o~o~o~o~o~o~o~o

তথ্যসূত্রঃ

*আল কোরআন, সূরা- ফাতিহা

*আল কোরআন, সূরা-বাকারা

*আল কোরআন সূরা- আনফাল

*আল কোরআন, সূরা মুত্বফিফিন

*আল কোরআন সূরা নূর

*আল।কোরআন সূরা নিসা

*https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Technology&oldid=1009556149

*National Research Council; Division on Engineering and Physical Sciences; Energy Engineering Board; Commission on Engineering and Technical Systems; Committee on Electricity in Economic Growth (১৯৮৬)। *Electricity in Economic Growth*। Washington, DC: National Academies Press। পৃষ্ঠা 16, 40। আইএসবিএন 978-0-309-03677-1। ৭ জুন ২০১৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৮ মে ২০১৫।

*https://www.tauhiderdak.com/2020/09

*আল কোরআন, সূরা তওবা

*আল কোরআন সূরা আলাক্ব

*abunoman72@ymail.com

*রেজোয়ান সিদ্দিকী সম্পাদিত, আজাদ ও সমকালীন সমাজ (ঢাকা : বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ১ম প্রকাশ, জুলাই ২০০৪), পৃ. ৩৯২। গৃহীত: দৈনিক আজাদ, সম্পাদকীয়, ৬ই মার্চ ১৯৬০, পৃ. ২।

*ড. মুহাম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত, ব্যবহারিক বাংলা অভিধান (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, নভেম্বর ২০১২), পৃঃ ৯৩৬।

* মুসলিম হা/১০২।

*. আব্দুল মুহসিন বিন নাদির আদ-দূসারী, আহকামুল গিশ্শ আত-তিজারী ফিল ফিক্বহি ওয়ান নিযাম, মাস্টার্স থিসিস, ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ, ১৪১৭ হিঃ, পৃঃ ১২।

*. মু‘জামু মাকায়ীসিল লুগাহ ৪/৩৮৩।

* লিসানুল আরাব ৬/৩২৩।

*. আবূ হাবীব, আল-কামূসুল ফিকহী ১/২৭৪।

*হাদিসে তিরমিজি শরীফ।

* তাজুল আরূস ১৭/২৯০।

*মুহাম্মাদ আব্দুল করীম নাসমান, জারীমাতুল গিশ্শ

*দৈনিক প্রথম আলো

*দৈনিক যুগান্তর

*মুসলিম হা/৮২; মিশকাত হা/৫৬৯।

.*বুখারী হা/৩৪৬১; মিশকাত হা/১৯৮।

*তিরমিযী হা/৩৮৯৫; মিশকাত হা/৩২৫২, হাদীছ ছহীহ।

ঠিকানাঃ

আমেনা বাতুল রুম্পা

বাসা ৪৩/৯/৪, শেখেরটেক ৬,

মোহাম্মদপুর, ঢাকা

০১৭১৫৭৫৮৭৮৭